KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78X24.13 c.m.
Vol. & Number ৫২/৯ ৫২/১০ ৫২/১১	Year of Publication পৌষ ১৩৯৮ // Jan 1992 মাঘ ১৩৯৮ // Feb 1992 ফাল্গুন ১৩৯৮ // March 1992
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C D Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

অবজ্ঞাত মেনশেভিক চিন্তাবিদ মার্টভের বিশ্লেষণের ধারায় রাশিয়ার অকটোবর বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলশেভিক—কমিউনিজমের অন্তর্ধানের রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর "বর্তমান যুগ, বলশেভিক কমিউনিজমের অন্তর্ধান ও মার্টভ" প্রবন্ধে।

সুধীর চক্রবর্তীর লালনবিষয়ক ধারাবাহিক রচনায় এবারের কিস্তিতে থাকছে লালনতত্ত্বের প্রবল পরাক্রমে ও জনপ্রিয় গ্রহণীয়তায় আতঙ্কিত ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধতার তথ্যবহুল ইতিবৃত্ত।

গণমাধ্যমগুলি কি লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং বিকাশের সহায়ক? ড· পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন।

মসীযুদ্ধের সৈনিক প্রেমচন্দকে নিয়ে একটি আদর্শ জীবনীগ্রন্থ প্রসঙ্গে শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা।

বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস কি কেবল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে? ভারতীয় জীবনে ইসলাম এবং সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে দুখানি গ্রন্থের গৌতম ভদ্র-কৃত সমালোচনা।

নাট্যকলার স্বরূপ সন্ধানে শম্ভু মিত্রের দেয়া জলসাঘর বক্তৃতামালা নিয়ে সংগ্রথিত গ্রন্থের বিশদ আলোচনা।

চিত্রকলায় বিমূর্ততার ক্রমবিকাশে ভাসিলি কান্ডেনিস্কির ভূমিকা নিয়ে অসীম রেজ-এর বিশ্লেষণসমৃদ্ধ সন্দর্ভ।

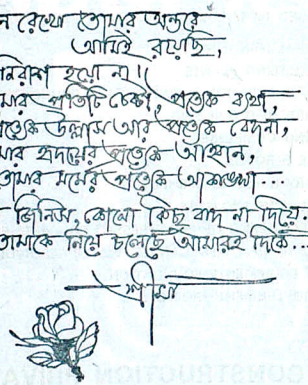

...মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ১০
ফেবরুয়ারি ১৯৯২
মাঘ ১৩৯৮

বর্তমান যুগ, বলশেভিক কমিউনিজমের অন্তর্ধান ও মার্টভ
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৭৬৯

ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির সুধীর চক্রবর্তী ৭৯০

গণমাধ্যম ও লোকসংস্কৃতি পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৮১৩

সম্মোহরাগিণী সুকুমার চৌধুরী ৭৮৬

দ্রৌপদী অথবা মর্জিনা ওমর আলী ৭৮৭

তোমার পায়ে বাজুক প্রীতিভূষণ চাকী ৭৮৮

গৃহবধূর আত্মহত্যা উর্মিলা চক্রবর্তী ৭৮৯

গুরু গুণময় মান্না ৮০৩

গ্রন্থসমালোচনা ৮১৯
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়,
রণেন্দ্রনাথ দেব

চিত্রকলা ৮৩৪
শিল্পে বিমূর্ততার ক্রমবিকাশ: ভাসিলি কানডেনিস্কির ভূমিকা
অসীম রেজ

মতামত ৮৪৫
দেবদাস জোয়ারদার, মীনাক্ষী ঘোষ, সোহিনী নাথ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

BOOKS THAT BREAK NEW GROUNDS

MAKING OF INDIAN LITERATURE

A Consolidated Report of Workshops
on Literary Translation (1986-88)

Ed : AYYAPPA PANIKER

A cumulative report of four workshops on literary translations organised by the Sahitya Akademi. Apart from factual accounts of the programmes and proceedings, it contains the text of select lectures delivered by visiting experts on various aspects of the translation of literature, historical surveys of translated literature in a few languages, discussions of the theoretical and practical problems of translation, views of eminent creative writers and resolutions and recommendations proposed by practising translators from all parts of India. Rs. 100

A HISTORY OF INDIAN LITERATURE

VOLUME VIII (1800-1910)

By : SISIR KUMAR DAS

Radically different from all existing models of literary history, *A History of Indian Literature* is an account of the literary activities of the Indian people carried through in many languages and under different social conditions. It explores the dynamics of literary production in India and idenfities the features of commonality among various literary traditions in the country without ignoring their diversities. It is a story of a multi-lingual literature, a plurality of linguistic expressions and cultural experience and also of the remarkable unity underlying them. Rs. 300

THE ENDLESS WEAVE

Tribal Songs and Tales of Orissa

Compiled, edited and translated by :
SITAKANT MAHAPATRA

This anthology presents a selection from the oral poetry of some of the tribal communities of Orissa and the oral tales prevalent among them. It includes as many varieties of song-poems and ethnic stories with as wide a range as possible from the points of view of theme, symbolism and style. Rs. 40

SAHITYA AKADEMI

Rabindra Bhavan, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-1
Jeevantara Bhavan, 23A/44X, Diamond Harbour Road
Calcutta-53, (Ph : 49-7406)

বর্তমান যুগ, বলশেভিক কমিউনিজমের অন্তর্ধান ও মার্টভ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লেনিনের ইতিহাস-দর্শন

লেনিন একদা বলেছিলেন, 'আমাদের যে-কোনো ব্যক্তির ধ্যানধারণার চেয়ে ইতিহাস সর্বদাই অতিরিক্ত ধূর্ত।' দ্বিতীয়-যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ইতিহাস, বিশেষত গত ছয় বছরের ইতিহাস পাঠ করলে মনে হয়—ইতিহাস লেনিনের চেয়েও বেশি ধূর্ত। আসল কথাটা বোধ হয় এই যে, বস্তুত কোনো ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাও বোধ হয় কখনও ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি পূর্বাহ্ণে নিখুঁতভাবে লক্ষ করতে পারে না।

আগে তো কতই না "পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের" কথা শোনা যেত; শোনা যেত "ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ" তথা সাম্রাজ্যবাদের কথা। কত তাত্ত্বিক বোঝাতেন—ওই যুগটা পুঁজিবাদের পতন আর শ্রমিকবিপ্লবের যুগ। কিন্তু কই, পুঁজিবাদ তো বেশ টিঁকে আছে বাড়বাড়ন্ত অবস্থায়। সাম্রাজ্য-হারা দেশগুলি দুঃস্থতার অতলে তলিয়েও তো গেল না আজও। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্বজা নিয়ে এমনকী আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, লাতিন আমেরিকায় কিংবা ভারতবর্ষে কোনো "বিপ্লব" তো হল না। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রের "সাধারণ সংকট" ক্রমশ ঘনীভূত হল। বর্তমানে তো সবই "পূর্বতন"—পূর্বতন "সোভিয়েত ইউনিয়ন", পূর্বতন "পূর্ব-ইউরোপের জনগণতন্ত্রগুলি", পূর্বতন "পূর্ব-জার্মানি", পূর্বতন "ওয়ারশ চুক্তি"ভুক্ত দেশ। বলশেভিক লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র আজ ক্ষয়িষ্ণু এবং বিলয়ের পথে।

কিন্তু কেন?

প্রশ্নটা খ্রুশ্চেভের রিপোর্ট বেরুবার পর ইতালির কমিউনিস্ট নেতা তোগলিয়াত্তি তুলেছিলেন। সমাজতন্ত্রের নামে এই যে স্বৈরাচারতন্ত্র এতদিন চালু ছিল, সে কি শুধু "ব্যক্তিপূজা"র কারণে? শুধু নেতাদের ব্যক্তিগত চারিত্রদৌর্বল্যে? শুধু সঠিক নীতিগুলিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করবার

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ায় প্রথম যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল তা চিহ্নিত হয় এই মাসের নামে। এর পরবর্তী পর্যায়ে এই বছরই সংঘটিত হয় অক্টোবর বিপ্লব। সেই ফেব্রুয়ারি বিপ্লব স্মরণে রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির কথা মনে রেখে এই বিশেষ প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হল।

অক্ষমতায়? তোগলিয়াত্তি বলেছিলেন, আরও গভীরে যেতে হবে, বুঝতে হবে ব্যবস্থাটার গলদটা কোথায়? কেন প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বৈরশাসন দেখা দিল, কেন ওসব দেশে আইন-কানুন বিধিবিধান না মেনে নিদারুণ হিংস্রনীতি চালু ছিল, কেন ওসব দেশে শুদ্ধিযজ্ঞের নামে এত নরবলি হল, কেন মূল-ধনতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, অর্থনীতির বিকাশের দৌড়ে, এসব দেশ হেরে গেল। এইসব কঠিন সত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে লাভ নেই। আসল কথা, বলশেভিক-লেনিনবাদের তত্ত্বকথায়, দর্শনে, কর্ম-কাণ্ডে, অর্থনীতিতে ভুল ছিল। শ্রমিক-একাধিপত্যের নামে একপার্টিনায়কতাধীন, গণতন্ত্রবিহীন, বদ্ধ সমাজের ভবিতব্য যা হবার, ইতিহাসে তাই ঘটতে দেখা গেছে।

কিন্তু এই ভবিতব্যের কথা কি পূর্বে কেউ ভাবেন নি? ভেবেছেন অনেকেই—বার্নস্টাইন, কার্ল কাউটস্কি, রোজা লাক্সেমবুর্গ, হিলফারডিং, রাশিয়ার প্লেখানভ, ট্রটস্কি, বুখারিন এবং মার্টভ—অনেকেই এই ব্যবস্থার করুণ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সেই ইতিহাসের খানিকটা নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধ।

আজকের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার চিত্রটা কী?

পাস্তারনেক যাকে বলেছিলেন "চল্লিশটি ভয়ংকর বছর", তা বহুদিন অতিক্রান্ত হবার পরও দেখা গেল—রাশিয়া ও অন্যান্য "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্রগুলি আসলে "জাতি-রাষ্ট্র" গড়ে তুলেছে। যুদ্ধ ও আগ্রাসন করে, পররাজ্য গ্রাস করেছে, নয়া-উপ-নিবেশবাদ স্থাপন করেছে। শক্তির জোরে জাতি-সমস্যা চেপে রেখেছে। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধিতে মনোযোগ না দিয়ে ঠাণ্ডাযুদ্ধের মহড়া দিয়ে কেবলই সমরসম্ভার বাড়িয়ে তুলেছে। তখন থেকেই এযুগের দূরদর্শী ভাবুকেরা বলেছেন—সমাজতন্ত্রের পন্থাসমূহ ভয়ংকর, কিন্তু তাদের ফলাফল সামান্য। ষাটের দশকে খ্রুশ্চেভ বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন; 'শ্রেণী-সংগ্রামটা এখন অর্থনীতির প্রতিযোগিতায়। বুর্জোয়ারা আমাদের কাছে হেরে যাবেই। শীগগিরই উৎপাদন-সামর্থ্যে আমরা তাদের ধরে ফেলব। ১৯৭০ সাল নাগাদ আমরা তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে।'

কিন্তু সেই ১৯৭০ সাল থেকেই বিশেষভাবে জানা গেল (বার্তাসমৃদ্ধ দূরদর্শন প্রভৃতির যুগে) যে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অবস্থা ভালো নয়। অর্থনীতিতে "সংকট" দেখা দিচ্ছে। কৃষি-উৎপাদনে অব্যবস্থা, ভোগ্যপণ্যে চিরন্তন ঘাটতি। নতুন সমাজ, নতুন মানুষ গড়ার দাবির অসারতাও ক্রমশই মানুষের গোচরে এল। তখন থেকেই চক্ষুষ্মান যাঁরা, তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন যে সমাজতন্ত্রের "সাধারণ সংকট" ক্রমশ জমা হবে এবং একসময় গোটা ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে (রোজার গারোদি, মিলোভান জিলাস দ্রষ্টব্য)। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই।

ভরাডুবি হবার পর, বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। রোগীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু হলে ভাবতেই হয়, চিন্তা করতে হয়—কোথায় ত্রুটিটা ছিল। এ ভাবনা প্রাসঙ্গিক। তবু যেসব ডাক্তার পূর্বাহ্নে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, তাঁদেরও সম্মান আর মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। ইতিহাসে সাফল্যটাই হয়তো বড়ো কথা, এবং সেজন্যই হয়তো বলশেভিক-লেনিনবাদ দীর্ঘ ৭৪ বছর রাজনীতি, অর্থনীতি, মতাদর্শের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রভুত্ব করে গেছে। বুক ফুলিয়ে বলেছে: 'সমাজতন্ত্র মানেই "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ"।' সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে কার্ল কাউটস্কি, রোজা লাক্সেমবুর্গ, প্লেখানভ, ট্রটস্কি, মার্টভ এবং আরো অনেকে গৌণ স্থান লাভ করেছেন।

মার্কসবাদী মহলে উপেক্ষিতরা

রাশিয়ার কথাই ধরা যাক। বলশেভিক-লেনিন-বাদীরা রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করে, প্রচারের মাধ্যমে, একটা মস্ত বড়ো মিথ্যা (ইলিউশন) চালু করে।

মিথ্যাটা হল, লেনিনবাদই রুশদেশের একমাত্র মার্কস-বাদী চিন্তাধারা। অথচ, ইতিহাস অন্য কথা বলে। প্রতিটি বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে মতপার্থক্য ছিল এমন অনেক "মার্কসবাদী" রুশদেশে ছিলেন। বলশেভিকরা তাঁদের নির্বাসনে পাঠায়, হত্যা করে, ইতিহাস থেকে তাঁদের নাম মুছে ফেলার প্রয়াস পায়। বুখারিনের তবু পুনর্বাসন হয়েছে; ট্রটস্কিও আজ আর অপাংক্তেয় নন। প্লেখানভ নিজের প্রতিভাতেই ভাস্বর। কিন্তু তাত্ত্বিক স্তরে লেনিনের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মার্টভের (Martov) নাম কজন জানেন?

বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে [History of the CPSU(B)] মার্টভের সামান্য উল্লেখ আছে। এমন কী ট্রটস্কির রুশ বিপ্লবের ইতিহাসেও মার্টভ (Martov) স্থান পান নি। অন্যত্র রুশ জো-হুকুম প্রচারকেরা মার্টভের ভূমিকাকে নস্যাৎ করে তাঁকে "শ্রমিকস্বার্থবিরোধী", "বিপ্লববিরোধী" বলে চিহ্নিত করেছেন। প্লেখানভের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে মনীষী লেনিনবাদকে প্রতিপদে চ্যালেনজ জানিয়েছিলেন এবং ইতিহাস যাঁর প্রজ্ঞার এবং দূরদর্শিতার সাক্ষ্য ক্রমশই তুলে ধরছে, সেই ব্যক্তি আজও মার্কসবাদী চিন্তার রাজ্যে উপেক্ষিতই রয়ে গেলেন।

মার্টভের কথা

অন্নদাশংকর রায় এক জায়গায় লিখেছিলেন: 'মানব-মাত্রেরই দুটো মৌল অধিকার আছে। একটি তো তার বাঁচবার অধিকার। আর একটি তার বংশরক্ষার অধিকার। এটা শুধু কায়িক অর্থে নয়, মানসিক বা সাংস্কৃতিক অর্থেও বটে।' মার্টভ এই দুটো অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। গুপ্ত পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি রাশিয়া ছেড়ে চলে যান (১৯২২) এবং দারিদ্র্যের মধ্যে যক্ষ্মারোগে মারা যান পঞ্চাশ বছর বয়সে (১৯২৩ সালে)। তাঁর কোনো প্রবন্ধ-সংগ্রহ নেই, রচনাবলী নেই—যা জীবিত থেকে তাঁকে জীবিত রাখবে। মহান পিটার কিংবা মহীয়সী ক্যাথারিনের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তিনি নন। মহান লেনিন এবং স্তালিনের মতো তিনি সফল বিপ্লবীও নন। কাজেই তাঁর কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই, যার মধ্যে তিনি জীবিত থাকবেন। দুঃখ হয় একথা ভেবে যে, মার্টভের মতো সুপণ্ডিত সংবেদনশীল বিবেকী মার্কসবাদীর সাংস্কৃতিক বংশরক্ষাও করা গেল না। তাঁর গ্রন্থমালা কিংবা প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নি। অন্তত তা দুষ্প্রাপ্য, ধনতান্ত্রিক দেশেও।

১৯৭৭ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হতে মার্টভের লেখা একটি পুস্তকের কপি আমি সংগ্রহ করি। পুস্তকটির নাম *State and the Socialist Revolution* (Translated by Integer, International Review, New York, 1938) মুখবন্ধ বাদে পুস্তকটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

১। *The Ideology of Sovietism*—(সোভিয়েতবাদের মতাদর্শ)।
২। *Dictatorship of the Minority: Dictatorship Over the Proletariat*—(সংখ্যালঘুর একনায়কী শাসন: প্রলে-তারিয়েতের উপরে চাপানো স্বৈরশাসন)।
৩। *Metaphysical Materialism and Dialectical*—(অধিবিদ্যাশ্রিত বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ)।
৪। *Marx and the State*—(মার্কস ও রাষ্ট্র)।
৫। *Commune of 1871*—(১৮৭১-এর কমিউন)।
৬। *Marx and the Commune*—(মার্কস ও কমিউন)।
৭। *Marx and the Dictatorship of the Proletariat*—(মার্কস ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কী শাসন)।

"ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস"-এ সেগাই দমিত্রিয়েভ ও ভি. ইভানভ নামে দুই "জোছকুম" ঐতিহাসিক (Novosty Press Agency Publishing House, Moscow, 1974) "টীকা"-তে মার্তভের এই পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেছেন: 'মার্তভ এল (১৮৭৩-১৯২৩) মেনশেভিকদের অন্যতম নেতা। রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি-র (R.S.D.L.P.) দ্বিতীয় কংগ্রেসে ইনি লেনিনের পার্টি-গঠন সম্পর্কিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় ইনি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বৈরিতাপূর্ণ, আপসমূলক অবস্থান অবলম্বন করেছিলেন। অকটোবর বিপ্লবের পর প্রতিবৈপ্লবিক শক্তির সঙ্গে যোগ দেন। ১৯২০ সালে রাশিয়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।' এই পরিচিতি অর্ধসত্য এবং অসত্যে ঠাসা।

রুশদেশে উনিশ শতকে সমাজচিন্তার ইতিহাস

রাশিয়ার উনিশ শতকের শেষার্ধের চিন্তার ইতিহাস আলোচনা করলেই মার্তভের অসামান্য বিপ্লবী প্রজ্ঞা ও মনস্বিতার প্রমাণ মেলে। রাশিয়ার সমাজসংস্কার ও বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাক। উনিশ শতকের মধ্যভাগে রাশিয়ার শিক্ষিত মানুষেরা এবং উদারচেতা বুদ্ধিজীবীরা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত ছিলেন। অবশ্য রাশিয়াকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করবার "পদ্ধতি" সম্পর্কে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। একটা গোষ্ঠীর মত ছিল এই যে, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বিচার করলে রাশিয়াকে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের "অংশ" বলে ধরা চলে না। সেজন্য তাঁরা বলতেন, প্রচলিত রুশ ব্যবস্থাগুলিকে ভিত্তি করে সংস্কার-ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। রুশীয়রা শ্লাভ ভাষাগোষ্ঠীরই অঙ্গবিশেষ, আর তাই যারা শ্লাভ আচার-ব্যবস্থা ও আদর্শের পক্ষপাতী ছিল তাদের "শ্লাভোফাইল" বা "শ্লাভ-স্বাজাত্যবাদী" নামে অভিহিত করা হত।

বিপরীত পক্ষে, আর-একটি গোষ্ঠী যে যুক্তি তুলে ধরত, তা এই যে, রাশিয়া যেহেতু ইউরোপীয় ঐতিহ্য-বোধের গঠনকল্পে কখনও যোগদান করে নি তাই সে পিছিয়ে রয়েছে। এদের বিশ্বাস ছিল, পশ্চিমকে দ্রুত অনুসরণ করলে এবং তাকে ধরে ফেললেই, রাশিয়ার মুক্তিলাভ ত্বরান্বিত হবে। এই চিন্তাধারার সমর্থকদের "পশ্চিমপন্থী" বলা হত। শ্লাভ-স্বাজাত্য-বাদী ও পশ্চিমপন্থীদের ভাবধারার উপর ভিত্তি করেই রাশিয়ায় রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল, অবশ্য তখনই যখন রাশিয়ার সর্বশেষ জার (সম্রাট) বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে ওইসব দল গঠনের সম্মতি দেন।

শ্লাভ-স্বাজাত্যবাদীদের কথা ছিল এই যে, রাশিয়া কৃষকের দেশ। তাঁরা রুশ কৃষক ও তাদের চিরায়ত ঐতিহ্য আর বিশ্বাসকে একটা ভাবাদর্শগত রূপ দিয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁদের আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চাষিকে (মুঝিক) একটা বিমূর্ত দৃষ্টিতে কল্পনা করে নিয়ে তাকে "মহিমান্বিত" করেও তুলেছিলেন এই গোষ্ঠীর অনেক মানুষ। এই আন্দোলনের ফলে "নারোদনিকি" আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মূল শ্লোগান ছিল—জনগণের দুয়ারে পৌঁছানো। কৃষকদের স্বার্থ দেখা, জনশিক্ষার বিস্তার—এ সবই ছিল নারোদনিকিদের কর্মধারার অন্তর্গত। গোড়ার দিকে শান্তিপূর্ণ গোষ্ঠীরূপে গড়ে উঠলেও কৃষকদের "মুক্তিলাভের পথ" হিসাবে কিছু নারোদনিকি সন্ত্রাসের পথ নেয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে রাশিয়ায় রাজনৈতিক হত্যা এক সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমপন্থীরা সংস্কারের ব্যাপারে "কৃষক কমিউন"-কে সম্ভাব্য হাতিয়ার বলে স্বীকার করেন নি। তার বদলে তাঁরা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (ইংলনডের ধরনে) ও সামাজিক সংস্কারের দৃষ্টান্তগুলিকেই আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল

যে, সংসদীয় শাসনব্যবস্থার, বিশেষত ইংল্যানডের দৃষ্টান্তগুলির উপর নির্ভর করে রাশিয়ার নবরূপায়ণ। এঁরা যেটা বোঝেন নি তা হল এই যে রাশিয়ায়, সে সময়, একটি শক্তিশালী "মধ্যবিত্ত শ্রেণী" তৈরি হয় নি। ফলে স্বৈরাচারতন্ত্রের জায়গায় সাংবিধানিক গণতন্ত্র চালু করবার আকাঙ্ক্ষাটা অবান্তরই ছিল।

ফ্রান্স, ইংলনড ও জার্মানিতে সে সময় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রুশ পশ্চিমপন্থী-দের অনেকে ওইসব দেশ থেকে সমাজ-সংস্কারকল্পে "সমাজতান্ত্রিক" চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিলেন। সমাজতন্ত্রীদের বিশ্বাস ছিল যে, সমাজের মঙ্গলের জন্য তাবৎ বৈষয়িক উদ্যোগ এবং সমাজসেবার কর্মসূচীগুলি সরকার কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত। উনিশ শতকের শেষার্ধে রাশিয়ার অবস্থাটা ছিল অদ্ভুত। এই কৃষকপ্রধান দেশে পশ্চিমী ধাঁচে সাংবিধানিক গণতন্ত্র (কিংবা রাজতন্ত্র) সৃষ্টির ভিত্তি ছিল না, শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে। অন্যদিকে পিছিয়ে-পড়া ওই দেশে শিল্পশ্রমিক গোষ্ঠী ছিল ক্ষুদ্র, ফলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাটিও ছিল বহুলাংশে অবাস্তব। বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হলেও সমাজতান্ত্রিক, বিশেষত কার্ল মার্কসের, চিন্তাধারা পরবর্তী কালে রাশিয়ায় সর্বাধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

তদানীন্তন রুশ সমাজ

রাশিয়ার সমাজটা ছিল মন্ত্রবদ্ধ শাস্ত্রবদ্ধ স্বৈরাচারতন্ত্রী সমাজ। রাজনৈতিক নিপীড়ন ও গুপ্ত তৎপরতার একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রাশিয়ায় গড়ে উঠেছিল। ফলে বিশ শতকের প্রথম দিকে ওই দেশে যেসব রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল সেগুলির মধ্যে একটা গুণবৈশিষ্ট্য থেকে গিয়েছিল। যেসব ব্যক্তি সেগুলি গড়ে তুলে-ছিলেন তাঁরা বাস্তব সমস্যাবলী নিয়ে মাথা ঘামানোর চাইতেও "তত্ত্বগত আলোচনা" আর বিতর্কের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

নারোদনিকি আন্দোলনের মধ্য থেকে জার-শাসিত রাশিয়ায় বৃহত্তম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় দলটি গড়ে উঠেছিল। আর সেটি হল "সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি" পার্টি। এই দলটি জমির সরকারি মালিকানার প্রস্তাব সমর্থন করলেও এমন একটি ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল, যাতে করে প্রশাসনক্ষমতার বেশির ভাগই রয়ে যায় কৃষি-কমিউনের হাতে।

রাশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় দলটি ছিল "সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক" পার্টি। তারা চেয়েছিল শ্রমিক-নিয়ন্ত্রিত রাজ যেখানে সব বৈষয়িক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-ভার প্রধানত শ্রমিকদের হাতে থাকবে। ১৮৯৮ খ্রী এই দলটি যখন তার প্রথম সম্মেলন আহ্বান করে, তাতেযোগদানকারী বহু সদস্যই জারের পুলিশবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়। তার ফলে দলের সদস্যরা গুপ্তভাবে অবস্থান করতে শুরু করে, গোপনে তাদের কাজকর্মও চলতে থাকে। ১৯০৩ সালে জারের পুলিশবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার জন্য দলের দ্বিতীয় সম্মেলনটি হয় লনডনে। ১৯০৩ সালেই বিপ্লব ও পার্টি-সংগঠনের প্রশ্ন নিয়ে লেনিন সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাঁর নিজস্ব দল—"বলশেভিক পার্টি" স্থাপন করেন। ওই সময় লেনিনের বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়ান, মার্তভ তাঁদের অন্যতম। তখন যাঁরা লেনিনের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁরা সবাই ছিলেন "মার্কসবাদী"। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটি দল—যেখানে সকলকেই সক্রিয়, চোস্ত বিপ্লবী হতে হবে না, কিন্তু দলটি হবে জনসমর্থনপুষ্ট গণতান্ত্রিক দল। শিল্পশ্রমিকরা সরকার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, লেনিন-বিরোধীদেরও সে ব্যাপারে সমর্থন ছিল। তবে এঁরা বিপ্লবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন নি বা সংসদীয় নীতিগুলিকে আগাগোড়া বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না। সে সময়ে এর বিশিষ্ট নামী সদস্যদের মধ্যে ট্রটস্কিও ছিলেন।

১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে নানা রকমের

কৌশল অবলম্বন করে লেনিনের উপদলটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলেও কার্যত বিরুদ্ধ দলটিই পার্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এই ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করে লেনিন তাঁর অনুগামীদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের রুশ প্রতিশব্দ "বলশেভিক" আখ্যা গ্রহণ করলেন আর অপর দলটি "মেনশেভিক" অর্থাৎ রুশ ভাষায় সংখ্যালঘিষ্ঠ বলেই অভিহিত হল।

লেনিনবাদের কথা

উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বিপ্লবী এবং অসামান্য কুশলী নেতা হিসাবে লেনিনের নাম সুপরিচিত। রুশ বিপ্লবের তিনিই ছিলেন প্রাণপুরুষ। নিজের উপর তাঁর এতই আস্থা আর বিশ্বাস ছিল যে তিনি মনে করতেন, যে "ভাষ্য" তিনি রচনা করবেন, তাই অভ্রান্ত সত্য। সেই ভাষ্যই প্রকৃত বিশুদ্ধ মার্কসবাদ। অন্য সব ভাষ্য এবং টীকাই ভেজাল-মেশানো, জলো, ভ্রমপ্রমাদে ভরা। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, লেনিনের সমসাময়িক সব দেশের প্রখ্যাত "মার্কসবাদী" নেতারাই লেনিনের মার্কসবাদের "ভাষ্য" অগ্রাহ্য করেছেন। প্লেখানভ, ট্রটস্কি, মার্টভ প্রমুখ মার্কসবাদীরা স্বদেশে লেনিনের প্রায় কোনো তত্ত্বই মেনে নেন নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রোজা লাক্সেমবুর্গ, কার্ল কাউটস্কি, হিলফারডিং এবং খোদ রুশদেশে সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা অর্থাৎ মেনশেভিকরা লেনিনের তত্ত্বের ভ্রান্তি ও বিপজ্জনকতা সম্পর্কে বিস্তর লেখালেখি করেন। প্লেখানভ, ট্রটস্কি, বুখারিন, মার্টভ প্রমুখ রুশ মার্কসবাদীরা অধিকাংশ প্রশ্নেই লেনিনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তত্ত্বালোচনায় কোণঠাসা হলে লেনিনবলতেন,—এরা হয় মূর্খ, নয়তো দলত্যাগী, বিপ্লববিরোধী ও সুবিধাবাদী। এঁরা মার্কসবাদকে রূপান্তরিত করতে চায় এক-ধরনের উদ্ভিদী, বৈষ্ণব-মার্কসবাদে।

মনে রাখা দরকার: সে কালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা লেনিনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলতেন: লেনিন মতান্ধ, সংকীর্ণতাবাদী এবং কলহপরায়ণ। তিনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু এবং বিতণ্ডাবাদী। তাঁরা লেনিনবাদী বলশেভিক আর গণতান্ত্রিক মেনশেভিকদের বিরোধ মেটাবার প্রয়াসও পেয়েছেন। কিন্তু লেনিন সেইসব প্রয়াসে সাড়া দেন নি। মিলেমিশে কাজ, ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ—এসব জিনিস লেনিনের কর্মযোগে স্থান পায় নি। তাঁর কাছে মার্কসবাদ ছিল সর্বশক্তিমান, কেননা এটা সত্য। আর সত্য তো স্বপ্রকাশ। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সহাবস্থান হবে কেমন করে?

মিথ্যার মুখোস খুলে দেবার তাড়নায় লেনিন তৎকালে প্রচলিত সব মতবাদকে আক্রমণ করেছেন—সে হোক না 'পপুলিজম', 'ইকোনমিজম', 'নারোদনিজম', "বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী", "লিবারেল গণতন্ত্রী", এবং "মেনশেভিক" মতবাদ। এঁদের "প্রতিক্রিয়াশীল", "বিপ্লববিরোধী" চরিত্র উন্মোচনে লেনিন সদাই তৎপর ছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন: 'এটা যেন আমার ভবিতব্য। রাজনৈতিক মূর্খামির, ফিলিস্টাইনতন্ত্রের—সুবিধাবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর একটার পর একটা লড়াইয়ের অভিযান চালাতে হয়েছে আমাকে। ১৮৯৩ থেকে এটাই চলে আসছে। এই জন্যই ফিলিস্টাইনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণাও চলে এসেছে।' তাঁর কথা ছিল: 'আমাদের যে-কোনো বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে, তা সে যত চটকদার আর কেতাদুরস্ত পোশাকেই নিজেকে সাজাক না কেন।'

১৯১৭ সালে পৃথিবী-কাঁপানো দশ দিনে লেনিনবাদ জয়ী হয়েছিল। আবার—১৯৮৫ থেকে আরম্ভ করে ছয় বৎসরে—সেই লেনিনবাদের ইমারত দেশে-দেশে ধসে পড়েছে। এখানেই ইতিহাসের পরিহাস-রসিকতা!

লেনিনবাদের সাফল্য কেন?

লেনিনবাদ বিশেষ ঘটনাসন্নিপাতে জয়ী হয়েছিল

কেন? ক্ষুধা হলেই মানুষ অন্নের "স্বপ্ন" দেখে। নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনা থাকলেই মানুষ "স্বপ্ন" দেখে শোষণহীন, মুক্ত সমাজের। পূর্বেই বলেছি, উনিশ শতকের শেষার্ধে, রুশদেশে আত্মপরিচয়ের ক্ষুধাটা নানা কারণে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই আত্মপরিচয়ের পথের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন রুশ ভাবুকেরা। সেই পথ-পরিক্রমাতে তাঁরা নানা ধরনের তন্ত্র-মন্ত্রের খোঁজ পেয়েছিলেন,—যথা গণতন্ত্র, বিপ্লবী সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, বলশেভিজম এবং মেনশেভিজম। নানা কারণে, বিশেষ অবস্থার বৈগুণ্যে, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে। বিজয়-গৌরবে স্ফীত হয়ে তারা শিশুদেহের উপর স্ফটিকস্তম্ভ নির্মাণের প্রয়াসও পায়। এই প্রয়াস একদিকে শৌর্য-বীর্যের মহিমায় উজ্জ্বল, অন্যদিকে অন্যায়, অবিচার, নৃশংসতা ও হিংস্রতায় কলঙ্কমলিন। ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং ক্ষমতা দখলই ছিল এই দলের চরম লক্ষ্য এবং বিপ্লবী হিংসাই ছিল এর পুজোপচার। বিপ্লবী হিংসা ইতিহাসের গতিপথে, মনুষ্যত্বের স্বার্থেই অপরিহার্য এবং "ক্ষমতার লোভ" শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বেলায় সঙ্গত ও ন্যায্য—এসব তর্ক শক্তিপূজক বলশেভিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্পর্ধার সঙ্গে দীর্ঘকাল উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই। আজ জানা গেছে, ঠিক এই কারণেই বলশেভিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ বরাবরই একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভার বহন করেছে, এবং কোনো নতুন "মানবিক সমাজ" সৃষ্টি করতে পারে নি।

বলশেভিক-লেনিনবাদ ও মার্টভদের মেনশেভিকবাদ

খোদ রুশদেশে মার্কসবাদের দুটি প্রধান ধারা ছিল—বলশেভিক আর মেনশেভিক। ১৯১৭ সালের অকটোবর বিপ্লবের কিছু কাল আগে পর্যন্ত দ্বিতীয়টিই ছিল অধিকাংশ মানুষের সমর্থনপুষ্ট। সাফল্যের গরিমায় একদা বলশেভিকরা এসেছিল ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সম্মুখে। অসাফল্যের গ্লানি নিয়ে মেনশেভিকরা গিয়েছিল নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে। ইতিহাসের চাকা আজ আবার ঘুরছে। বলশেভিক "ব্যবস্থা" ভেঙে পড়ছে দেশে-দেশে। কিন্তু মেনশেভিকদের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধ্যানধারণার পুনরুজ্জীবন ঘটছে। অতীত ইতিহাসের পাতা ওলটাচ্ছেন অনেকে। রাজনীতিতে যেসব মার্কসবাদী ভাবুক এতদিন "উপেক্ষিত" ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসাও ক্রমশ বৃদ্ধিপাচ্ছে। বার্নস্টাইন, কাউটস্কি, রোজা লাক্সেমবুর্গ, অর্থনীতিতে হিলফারডিঙ, রুশদেশের ট্রটস্কি, বুখারিন, মার্টভ আবার সম্মুখে আসছেন।

বলশেভিকদের সঙ্গে প্লেখানভ, ট্রটস্কি, মার্টভ প্রমুখ মেনশেভিক মার্কসবাদীদের "তাত্ত্বিক" বিরোধ কোন্ কোন্ বিষয়ে?

বলশেভিক ও মেনশেভিক তত্ত্ব-বিরোধ

আগে মার্টভের যে বইটির উল্লেখ করেছি তার থেকে, মেনশেভিকদের অন্যান্য লেখাপত্র থেকে পাঁচটি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য চিহ্নিত করা চলে—(ক) রুশদেশে বিপ্লবের স্তর ও চরিত্র প্রসঙ্গে; (খ) গণতন্ত্রের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে; (গ) লেনিনবাদী পার্টি-সংগঠন প্রসঙ্গে; (ঘ) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কী শাসন প্রসঙ্গে।

(ক) প্রথম পার্থক্যটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্লেখানভ ও মার্টভসহ সব মেনশেভিকদের কথা ছিল যে, রাশিয়া রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে আর গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে, তুলনায় অনুন্নত, পিছিয়ে-পড়া দেশ। এই গ্রাম-প্রতিষ্ঠিত কৃষিপ্রধান দেশটি ইউরোপের তুলনায় অতি-দীন। এই দৈন্যের কারণ আছে জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। তাই রুশ সমাজের মানুষের "সমগ্র জীবনধারা"কে এক করে ধরে, ভিতরে এবং বাইরে এর প্রতিকার করে সমাজটাকে প্রথমে "আধুনিক" ও "গণতান্ত্রিক" করে তুলতে হবে। সমাজটা যেহেতু

কোনো কারখানাঘরের ঢালাই-পেটাই-করা কারিগরের ছাপ-মারা জিনিস নয়, সেজন্য ইচ্ছেমতো সমাজটাকে আচমকা বদলানো যাবে না। প্রথম পর্বে চাই, রাশিয়ার গণতান্ত্রিক রূপায়ণ। তার পর শিল্পবহুল, যন্ত্রবহুল রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নটা ইতিহাসের কর্মসূচীতে স্থান পাবে।

মার্কসের যে বিচারের উপর মেনশেভিক মার্কসবাদীরা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন সেটি উদ্‌ধৃত করছি :

(a) We can in broad outline designate the Asiatic the classical the feudal and the modern bourgeois forms of production as progressive epochs in the economic formation of society.

এবং

(b) No social order is destroyed until all the productive forces for which it gives scope have been developed ; new and higher productive relations cannot appear until the material conditions for their existence have ripened within the womb of the old social order. Therefore, mankind in general never sets itself problems it cannot solve : since looked at more closely, we always find that the problem arises only when the material conditions for its solution exist or at least, are already in process of formation.

মেনশেভিকদের বিচারধারাটা ছিল এইরকম। তাঁরা বলতেন—সমাজের পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাত্রা ইতিহাসের গতিপথে ঘটে। কিন্তু অনুন্নত, পশ্চাৎপদ রুশদেশকে ইচ্ছামন্ত্রের জোরে, সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ করা যাবে না। মার্কসের কথাই হল, ইচ্ছামতো এক পর্ব থেকে উল্লম্ফন সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় পিছনে ফেরা। ধনতন্ত্রকে অশুচি ভেবে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে "সরাসরি" "এক লাফে" সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো সম্ভব নয়। মেনশেভিকরা বলতেন, রুশদেশে কারখানা উৎপাদন হচ্ছে, ধনতন্ত্র এসেছে ঠিকই। কিন্তু এই শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত নতুন প্রাণশক্তি আর চিৎ-শক্তি পূর্ণতা লাভ করবে না। রুশ সমাজের গর্ভে নতুন ব্যবস্থার অস্তিত্বের উপযোগী "পূর্বশর্তাবলী"র সৃষ্টি আগে হোক। তখনই উৎপাদন-সামর্থ্যে, কর্মে, মননে ও কর্মকুশলতায় রাশিয়া আধুনিক, শিল্পবহুল সমাজ হয়ে উঠবে। তার আগে, অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার আগেই "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের কর্তব্যভার বহনের প্রশ্ন অবান্তর। রুশ সমাজের সেটাই কর্তব্য যা সমাধা করার মতো অনুকূল বাস্তব অবস্থা সমাজে বিদ্যমান। জার স্বৈরাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মন্ত্রবদ্ধ, পিছিয়ে-পড়া কৃষকসমাজের আধুনিকীকরণ এবং গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন—এগুলিই রুশ দেশপ্রেমিকদের আশু কর্তব্য। তাঁরা বলতেন—রুশ সমাজের মতো অপরিপক্ব, অনুন্নত কৃষকসমাজে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মতৎপরতা ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোতবারই সমতুল্য। লেনিনের বক্তব্য কী ছিল? অন্যান্য মার্কসবাদীদের মতো লেনিনও স্বীকার করতেন যে, রুশবিপ্লব "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" বিপ্লবই হবে। কিন্তু শুধু জারের স্বৈরাচারতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করলেই হবে না। সঙ্গে-সঙ্গে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী "সমাজতান্ত্রিক" আন্দোলনও গড়ে তুলতে হবে। লেনিন বলতেন—আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলন পুঁজিবাদী যুগের প্রথম আমলের চিরায়ত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি হবে না। প্রথম আমলের পুঁজিবাদী যুগে, বুর্জোয়াদের উদ্ভব ঘটেছিল বিপ্লবী শক্তিরূপে। তখন তারা ছিল প্রগতিশীল শক্তি। কিন্তু "সাম্রাজ্যবাদী যুগে", বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র হবে আলাদা। সমকালীন বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা হবে শ্রমিকশ্রেণীর—প্রলেতারিয়েতের। কেন? কারণ—বর্তমান যুগে, শুধু যে তারা সবচাইতে শক্তিশালী শ্রেণী তাই নয়, রুশ সমাজে সুসঙ্গত-ভাবে তারাই "একমাত্র বিপ্লবী" শ্রেণী (class)। বলশেভিক-লেনিনবাদের বক্তব্য ছিল—রুশিয়ার

বুর্জোয়ারা জারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চাইতে তার সঙ্গে রফা (compromise) করতেই বেশি আগ্রহী। এই অবস্থায় দেশে যে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন আনতে হবে, সেই আন্দোলনই "বিরতিহীনভাবে" পূর্ণতা লাভ করবে সমাজতন্ত্রে। সমাজতান্ত্রিক সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে।

সত্যি কথা, দেশের মানুষের মধ্যে শ্রমিকরা নেহাতই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু লক্ষ-লক্ষ কৃষক তার সহযোগী এবং মিত্র। প্রলেতারীয় বিপ্লবের সূত্রপাত হলেই এরা প্রলেতারিয়েতের পাশে এসে দাঁড়াবে।

সহজেই বোঝা যাবে যে, বলশেভিক আর মেনশেভিক চিন্তাধারা দুই মেরুতে অবস্থিত। মেনশেভিকরা বলতেন "বিপ্লব করা" যায় না। কোনো দেশের প্রাকৃতিগত ও স্বাভাবিক বেগে বিপ্লব ঘটে। কোনো অপরিপক্ব সমাজকে (যে সমাজ শিল্প-বহুল, যন্ত্রবহুল, গণতান্ত্রিক, নাগরিক সমাজ হয়ে ওঠে নি) যদি অনুকূল পরিস্থিতিতে, পার্টির শক্তির জোরে নির্জমিদার, নির্মহাজন, নিঃ-পুঁজিবাদী করা সম্ভব হয়-ও, সমাজ অপ্রস্তুত থাকায়—জমি তৈরি না হওয়ায় সেখানে ফলন ভালো হবে না। বিপ্লবোত্তর সমাজ যে "তন্ত্র" মেনে অগ্রসর হবে, তাতে পুরানো তন্ত্রের অনেক ক্লেদ ও গ্লানি থেকেই যাবে।

অন্যপক্ষে, বলশেভিক-লেনিনবাদী বিচারটা ছিল অনেকটা গল্পের বিপ্লবী বউমাদের মতো। বউমারা যেন বলছেন : 'অত্যাচারী শাশুড়িগুলিকে (তুলনীয় স্বৈরাচারতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, পুঁজিবাদ) গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাবার সময় এসে গেছে। তাহলেই আমরা নিরাপদ হব।'

মেনশেভিকরা বউমাদের বিচার গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বলতেন—বে-টাইমে শাশুড়িগুলিকে গঙ্গা-যাত্রা করালে শাশুড়িদের ভূত ঘাড়ে চেপে বসবে; শাশুড়িতর, শাশুড়িতম অত্যাচারী শক্তির আবির্ভাব হবে। রাজনীতিতে দেখা দেবে নানা দুঃশাসনের শক্তি, নানা স্বৈরাচারী গোষ্ঠী-চক্র ও সম্প্রদায়। তেমনি, বে-টাইমে "শ্রমিক-বিপ্লব" ঘটালে দেখা যাবে প্রাক্-বিপ্লবীযুগে যারা শুধু শোষণহীন সমাজের "নাম"-জপ করে এসেছে, প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের "উৎকর্ষের বাণী" প্রচার করেছে, বিষয়পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, তারাই "নাম"-জপ ছেড়ে আমিষে ফিরে গেছে। আর আমিষে তাদের কী লোভ! বিড়াল বনবিড়াল হয়ে যাবে।

সাম্প্রতিক ইতিহাস দেখাচ্ছে যে, বলশেভিক-লেনিনবাদী শাসনে—সবসমাজতান্ত্রিক দেশে—হয়েও ছিল তাই। ওইসব দেশে আবির্ভূত হয়েছিল পার্টির মোড়লতন্ত্র, রাষ্ট্রের স্বৈরাচারতন্ত্র এবং আমলা-তন্ত্র, অর্থনীতিতে ফৌজি শাসন।

উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি :

লেনিনের মূল শিক্ষাটা ছিল "গণতন্ত্র" একটা "শ্রেণী-গত" ধারণামাত্র। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের বক্তব্য বাতিল করে লেনিন বলেন : "'শ্রেণী"র উপরে কোনো অখণ্ড এবং বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতের প্রতি "সমানভাবে প্রযোজ্য" কোনো ব্যবস্থা স্বীকার করা চলে না। বুর্জোয়া সমাজে গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাই নেই। যে সমাজে কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, খনি, রেলওয়ে ও অন্যান্য সম্পদ জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশের হাতে, যে সমাজে তাই জনগণের "শোষণ" বর্তমান, সেখানে গণতন্ত্রের কথা বলা লোকঠকানো ব্যাপার।' সাধারণভাবে লেনিন তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে কপটতাপূর্ণ, "সীমাবদ্ধ, বুর্জোয়াদের একাধিপত্য" হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আগেই বলেছি, পরে যাঁরা "মেনশেভিক" বলে চিহ্নিত হন তাঁরাও সবাই রুশ সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক দলের সদস্য ও মার্কসবাদী ছিলেন। তাঁদের ধারণায় "সমাজতন্ত্র" চরম লক্ষ্য হলেও শ্রমিকদের মুক্তির জন্য প্রথমেই গণতন্ত্র

চাই, যে গণতন্ত্র ইংল্যানড এবং আমেরিকায় আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শগুলির গুরুত্ব তাঁরা বরাবরই স্বীকার করেছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্র কপটতাপূর্ণ ধোঁকাবাজি—এই মত তাঁরা মেনেনেন নি। প্লেখানভ, ট্রটস্কি (১৯১৭ পর্যন্ত) এবং মার্টভ সমাজতন্ত্রের স্বার্থেই পূর্ণ গণতন্ত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। ১৮৯৮ সালে মিন্স্কে ওই পার্টির প্রথম কংগ্রেসের ইস্তাহার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাটা কেমন?

'It is completely deprived of what its foreign comrades freely and quietly enjoys : Participation in the administration of the state, freedom of speech and of the press, freedom of organisation and, assembly, in a word, all those instruments and means with which the West-European and American proletariat improves its position and at the same time struggles for its final liberation against private property and capitalism,—for socialism.

বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে নাসিকাকুঞ্চন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথাপদ্ধতিকে বাতিল করতে মেনশেভিকরা কোনো দিনই সম্মত হন নি। সমাজতন্ত্রের আগে চাই "গণতন্ত্র"—বরাবরই এটা ছিল তাঁদের বিশ্বাস। রুশদেশের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীরা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি নেবে? মেনশেভিকরা বলতেন, সংগ্রাম ও সহযোগিতা। উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা যদি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বৈরিভাব না দেখায়, তারা যদি সমাজের গণতন্ত্রীকরণের বিপক্ষে না দাঁড়ায় তবে তাদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে যেতে মেনশেভিকদের আপত্তি ছিল না। তাঁদের মত ছিল এই যে, বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক ভূমিকা আজও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় নি। কৃষিপ্রধান পিছিয়ে-পড়া সমাজে বুর্জোয়ারা উৎপাদিকা শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ফলে, তুলির এক আঁচড়ে তাদের "প্রতিক্রিয়াশীল" হিসাবে অঙ্কন করাটা ভুল। ভুল একথাটাও যে শ্রমিকশ্রেণীরই শুধু বিপ্লবী-নায়কোচিত গুণাবলী আছে। মেনশেভিকরা গণতন্ত্রকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সমাজতন্ত্রের উন্মাদনায় এই গুরুত্বকে কোনোদিনই তাঁরা লাঘব করেন নি। লেনিন সোস্যাল - ডেমোক্র্যাটদের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন, বলতেন: 'সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা যেসব তত্ত্ব কপচায়' সেগুলি 'আসলে সোস্যাল-ডিমোক্রেসিপনার উপর বুর্জোয়া কারচুপি', শ্রেণীসংগ্রাম কথাটার সুবিধাবাদী বিকৃতি। "বুর্জোয়া কারচুপি" করে সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা যে কথা বলত, লেনিন তার বস্তুসংক্ষেপ করেছেন। তারা নাকি বলত, 'আমাদের দেশের বিপ্লব সমগ্র জনগণের বিপ্লব। অতএব, আলাদা শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকদের উচিত শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা; কাণ্ডজ্ঞানের নামে তাদের উচিত ট্রেড-ইউনিয়ন এবং ওইসব সংগঠনের বৈধকরণে মনোযোগ দেওয়া। উচিত এই ট্রেড-ইউনিয়নকেই নিজেদের শিক্ষা এবং সংগঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যাত্রাবিন্দু বলে গণ্য করা; উচিত বিপ্লবী পরিস্থিতিতে নয়া "ইস্ক্রা"-এর মতো ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রচনা করা, উচিত উদারনীতিবাদের প্রতি অধিক অনুকূল মনোভাবাপন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিও যত্নপর হওয়া; এমন সব নেতাদের পছন্দ করা উচিত যাদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যবহারিক পরিচালক হবার প্রবণতা আছে। উদারনীতিবাদের প্রতি অনুকূলমনোভাবাপন্ন হওয়াতেই লেনিনের এত ক্রোধ আর বিক্ষোভ। কারণ "গণতন্ত্র" সম্পর্কে তাঁর বরাবরই প্রবল ঘৃণা ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের প্রসঙ্গে

ধনতন্ত্রের পাঁকে-ডোবা পৃথিবীটাকে উপরে টেনে তুলবে কে? এখানেই আসে লেনিনের পার্টি-গড়ার

তত্ত্বকথা। প্রকৃতপক্ষে, পার্টিসংগঠনের নীতিই বিপ্লবকুশলী লেনিনের অসামান্য অবদান। প্রথম আন্তর্জাতিকের বিধিবিধান রচনায় মার্কসের হাত ছিল। কিন্তু তিনিও এ ধরনের পার্টি গড়ার কথা ভাবতে পারেন নি। লেনিনের কথাটা কী? রাজামহারাজা-জমিদার-মহাজনদের দিন তো শেষ হচ্ছে। বুর্জোয়ারা পৃথিবীর উপর ছড়ি ঘোরালেও ক্রমশ অধঃপাতে যাচ্ছে। প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী যুগে তবুও বা এদের খানিকটা "প্রগতিশীল" ভূমিকা ছিল। কিন্তু "সাম্রাজ্যবাদী যুগে" এরা শুধুই চরিত্রহীন, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী। এ যুগে তাহলে পৃথিবীটার মুক্তির পথ কী? কে দেখাবে?

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীতে আছে কোনো এক সুদূর অতীতে বরাহ-অবতার তার দাঁতের ঠেলায় ধরণীকে পাঁক থেকে তুলেছিলেন। এই পুঁজিরাদী কলিযুগে শ্রমিকশ্রেণী রূপী-বরাহ-অবতারটি তার বিপ্লবী শক্তির জোরে, নিখিল ভুবনকে পৌঁছে দেবে সমাজতন্ত্রের অমরাবতীতে। সাদামাটা ভাষায় এটাই হল লেনিনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার মূল প্রেরণা।

এই যে লেনিনবাদী-বলশেভিক পার্টি, এক "নতুন" ধরনের সংগঠন। লেনিন বলেছেন—'ক্ষমতালাভের সংগ্রামে 'সংগঠন' ছাড়া প্রলেতারিয়েতের আর কোনো অস্ত্র নেই।' সংগঠনের বাস্তব ঐক্যের দ্বারা বলীয়ান হয়ে মার্কসবাদের ভিত্তিতে, ভাবাদর্শগত একীকরণের মাধ্যমেই শুধু প্রলেতারিয়েত একটি অজেয় শক্তিতে পরিণত হতে পারে। অনিবার্যভাবে এরা হবেও। কমিউনিস্ট পার্টি কোনো সাধারণ সংগঠন নয়। সেনাবাহিনীর সঙ্গেই একে তুলনা করা চলে। লেনিনও সামরিক ভাষায়ই পার্টির বর্ণনা করেছেন। 'এই সংগঠন লক্ষ-লক্ষ শ্রমজীবীকে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমিকবাহিনীর একটি "সেনা-বাহিনী"-র মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে। রুশদেশের ভীমরতিগ্রস্ত স্বৈরাচারী শাসন, অথবা আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের শাসন, কোনোটাই এই সেনাবাহিনীকে নিরস্ত করতে সক্ষম হবে না।' এই লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি খেলামেলা কোনো বুর্জোয়া পার্টি নয়। ইংল্যানডের শ্রমিক দলের সঙ্গেও এর কোনো সাদৃশ্য নেই। সামরিক পদ্ধতিতে সংগঠিত, স্তরবিন্যস্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ এই পার্টি এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পার্টি। এই পার্টি গঠিত হবে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়ে। লেনিন বলেছেন, শ্রমিকদের ইচ্ছামতো, স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে দিলে তারা শুধু ট্রেড-ইউনিয়নের কাজে আবদ্ধ থাকবে, রুটি-রুজির লড়াই চালাবে। তারা উচ্চতর মজুরির কথা, কাজের ঘণ্টা কমানোর কথা বোঝে। কিন্তু নিজে থেকে সমাজতন্ত্রের কথা, বিপ্লবের কথা বোঝে না। শুধু ট্রেড ইউনিয়ন করলে তো আর ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ হবে না, মজুরি-দাসত্বও যাবে না। শিল্পপতিদের ঘটে বুদ্ধি আছে। তারা শ্রমিকদের অল্পস্বল্প সুযোগ-সুবিধা দেবে। শ্রমিকরাও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে থেকে আশু দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবে। ফলে ধনতন্ত্র টিঁকেই থাকবে।

এই বিচার থেকেই লেনিন নিজস্ব পার্টি-তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। রাশিয়ার শ্রমিকদল ভেঙে "বলশেভিক পার্টি" গড়ে তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য হল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি চাই-ই শ্রমিকরা বিপ্লবের সেনাবাহিনী বটে, তবে সে বাহিনী চালাবে কে? নেতৃত্ব দেবে কে? কমিউনিস্ট পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীর "অগ্রণী বাহিনী"। শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখ-সারির সেনাপতিমণ্ডলীই কমিউনিস্ট পার্টি। শ্রমিকদের সঙ্গে পার্টির পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা এইখানে যে, শ্রমিকদের চৈতন্যের পরিসর ট্রেডইউনিয়ন পর্যন্ত। অন্যদিকে, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির আছে শৃঙ্খলাপরায়ণতা, উচ্চাঙ্গের রাজনৈতিক সচেতনতা, মার্কসবাদ সম্পর্কে জ্ঞান। পার্টি সুসংগঠিত হয় "উপর থেকে"; মেনে চলে "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা"র নীতি। ফলে, পার্টিতে থাকে একপাথুরে একতা আর সংহতি, সংখ্যাগুরুর প্রতি সংখ্যালঘুর

প্রশ্নাতীত বশ্যতা। পার্টির সব সদস্যই লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতা মেনে কাজ করে এবং পার্টির অভ্যন্তরে উপদল, চক্র গড়ে তোলার যে-কোনো প্রয়াসকে গোড়াতেই প্রতিহত করে। শুধু এই ধরনের পার্টির নেতৃত্বে আর পরিচালনায় "বিপ্লব" সম্ভব হতে পারে—আবির্ভাব হতে পারে "সমাজতান্ত্রিক" সমাজের।

লেনিনবাদী পার্টি-তত্ত্বই যে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের গঙ্গাযাত্রা ঘটিয়েছে, দেশে-দেশে জন্ম দিয়েছে স্বার্থপর, আত্মসুখপরায়ণ, ক্ষমতালোলুপ পার্টি-মোড়লতন্ত্র, জন্ম দিয়েছে গণতন্ত্রবিহীন পার্টি-স্বৈরাচার-তন্ত্রের—একথা আজ তো অনেকের উপলব্ধিতে এসেছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, লেনিনের সমসাময়িক রুশ সোসাল-ডেমোক্রেটিক পার্টিতে বহু "মার্কসবাদী" এই পার্টি-তত্ত্বের বিষময় ফল সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদের মধ্যে ট্রটস্কি আর মার্টভ সর্বাগ্রগণ্য। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ট্রটস্কির—কিন্তু সুসঙ্গতভাবে তাত্ত্বিক স্তরে মার্টভের বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মার্টভ তো দ্বিতীয় কংগ্রেসে ১৯০৩ সালে পার্টি-গঠনের লেনিনবাদী "নীতি"-র বিরুদ্ধে রীতিমতো লড়াই করেছিলেন, বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্লেখানভের সমর্থন পেলেও লেনিনের প্রস্তাব প্রথম অধিবেশনে পরাস্ত হয়। তাঁর কথা ছিল, লেনিনের উপর থেকে পার্টি-গড়ার (from the top) নীতি কারখানা-পরিচালনার নীতিরই সগোত্র। লেনিন চান পার্টি-সদস্যরা একান্ত বশংবদ হবে, পার্টি-যন্ত্রে তাদের ভূমিকা হবে নাট-বল্টুর মতো। মেনশেভিকদের প্রস্তাব ছিল পার্টি হবে শ্রমিকদের পার্টি—উৎসর্গীকৃতপ্রাণ পেশাদার বিপ্লবীদের শুধু নয়। পার্টির কার্যধারা হবে প্রকাশ্য এবং গণতান্ত্রিক। পার্টির অভ্যন্তরে নানা মতের সহাবস্থান স্বীকার করতে হবে। নানা স্তরের মানুষ, বিভিন্ন প্রবণতার মানুষ, সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, সংঘ গড়ে তুলতে হবে এবং পার্টির কর্মসূচী মেনে কাজ করবে।

"পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী"—লেনিনের এই তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন মেনশেভিকরা। তাঁরা বলেছেন, এই "অগ্রণী-বাহিনী-তত্ত্ব" পার্টিতে নিয়ে আসবে দাদাগিরি অভিভাবকতন্ত্র এবং মোড়ল-তন্ত্র। অতএব, কোনো গণতন্ত্রী কিংবা সমাজতন্ত্রী এ ধরনের পার্টি-সংগঠন মেনে নিতে পারে না। মেনশেভিকদের দাবি ছিল, ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা অন্যান্য সংগঠনের অটোনমি, স্বশাসন বহাল রাখতে হবে। এদের কর্মধারায় পার্টির হস্তক্ষেপ কিংবা নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-আন্দোলনেরই ক্ষতি করবে। অর্থাৎ এক কথায় এক সর্বগ্রাসী যন্ত্রদানব হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলার লেনিনবাদী নীতির বিরুদ্ধে মেনশেভিকরা নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য—লেনিনবাদী dictatorship of the proletariat-তত্ত্ব :

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরকালে "সমাজ-তান্ত্রিক ভিত্তি" হবে পার্টি-নেতৃত্বে সর্বহারা শ্রমিক-শ্রেণীর "একনায়কী শাসন"। প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক সব সমাজই উদ্ভূত তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সমাজ থেকে। পক্ষান্তরে, সোভিয়েত ব্যবস্থার উদ্ভব কিন্তু ধনতন্ত্র থেকে হয় নি, হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষক সমাজকে, পার্টির শক্তির জোরে, রূপান্তরিত করে। সঙ্গতভাবেই পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কী শাসন বাদ দিয়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে টিঁকিয়ে রাখাই অসম্ভব হত। মার্কসে যে "dictatorship of the proletariat" কথা আছে, তার অর্থ শ্রমিকদের গণতন্ত্র, কেননা যে সমাজ শ্রমিকপ্রধান সেখানে শ্রমিকরা ক্ষমতা পেয়ে গণতন্ত্রের পূর্ণতার জন্য লড়াই চালাবে। বিপ্লব-বিরোধী সংখ্যালঘু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে নিরস্ত করার জন্য তাদের

কঠোর শাসনব্যবস্থার আয়োজনও রাখতে হবে (একনায়কী শাসন)। লেনিন স্থানকালপাত্র বিচার না করে বলেই দেন (বিপ্লবের বহু পূর্বে) যে, শুধু "শ্রেণীসংগ্রাম" মেনে নিলেই বিপ্লবী হওয়া যায় না, বিপ্লবীর পরিচয় পাওয়া যাবে তখনই যখন সে dictatorship of the proletariat-কে সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নেবে। মার্টভ প্রমুখ মেনশেভিকদের (১৯১৭ সাল পর্যন্ত ট্রটস্কিরও) বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মার্কস "সাম্যবাদী ইস্তাহারে" বলেছেন, শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম ধাপটা হল প্রলেতারিয়েতকে শাসকশ্রেণীর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, গণতন্ত্রের লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করা ;

The first step in the revolution by the working class is to raise the proletariat to the position of the ruling class, to win the battle of democracy.

তিনি আরও বলেছেন, সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যাভিমুখী যে বিপ্লব তা উপর থেকে চাপানো ব্যাপার নয়, এ বিপ্লব

Selfconscious independent movement of the immense majority in the interests of the immense majority (*Manifesto*).

বিপ্লবের হোতা শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ, সংখ্যা-গরিষ্ঠের জন্যই এই বিপ্লব। পার্টির এটা খাস তালুক নয়।

১৮৭১ সালের পারি কমিউনকেও মার্কস শ্রমিক একাধিপত্যের প্রথম উদাহরণ হিসাবে স্বাগত জানিয়ে-ছিলেন। কোনো অবস্থায়ই "সংখ্যালঘু" এক জন-সমষ্টির সর্বময় কর্তৃত্ব শ্রমিক-একাধিপত্যের নামে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন শ্রমিক-রাজ হিসাবে মার্কসের অনুমোদন পেত না। ট্রটস্কি গোড়ায় লেনিনের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। মার্টভ তো বলেছেনই যে, কৃষকপ্রধান (যেখানে শ্রমিকরা সংখ্যালঘু শ্রেণী) সমাজে শ্রমিকশ্রেণী নগণ্য "সংখ্যালঘু" সম্প্রদায়। এহেন সমাজে যার পরিচালনায়ই হোক না কেন কেন, প্রলেতারীয় একনায়কী শাসনে কখনোই "গণতন্ত্র" হতে পারে না। রাশিয়ার সমাজ একলাফে প্রলেতারীয় বিপ্লবে উপনীত হবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। এহেন সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কী শাসন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয়, বিপজ্জনক ব্যবস্থাও বটে। মার্টভ বলেছেন, লেনিনের শ্লোগান ছিল dictatorship of the proletariat। কিন্তু আসলে তিনি চান dictatorship over the proletariat। এই একনায়কী শাসন সংখ্যালঘুর স্বৈরাচারতন্ত্রেরই জন্ম দেবে, শ্রমিকশ্রেণীকে পরবশ্যতার শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলবে।

রুশ বিপ্লবের ইতিহাস

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ায় তিনশ বছরের প্রাচীন রোমানভ রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। সংগঠিত কোনো বিপ্লবের ফলে যে এই পতন ঘটে, তা নয় নিজের ভারেই তার পতন ঘটেছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এত আকস্মিক ও অগোছালো রকমের ছিল যে, এর পরে ঠিক কী যে ঘটবে সে সম্বন্ধে কেউই নিশ্চিন্ত ছিল না, বিক্ষোভের সুপরিচিত নেতা বলতে কেউ ছিল না, আর পূর্ববর্তী সরকারের সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী বলতেও কেউ ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালের কথা স্মরণ করে বিভিন্ন শ্রমিক সম্প্রদায়ের ও সৈন্যদের প্রতিনিধিরা একটি "পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত" গঠনকল্পে যথাসত্বর একটি নির্বাচনের ব্যবস্থাদি করার আয়োজন করে। রাশিয়ার পার্লামেনটের (ডুমার) অনুমতি না নিয়েই তারা একটি সভায় মিলিত হয়ে সরকারি শাসনভার গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়। নানা পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি "মন্ত্রিপরিষদ" নিয়ে গঠিত হল একটি "অস্থায়ী সরকার"। রক্ষীদল প্রমুখ বিপ্লবমুখী দলগুলিকে নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হল। তাতে অন্তর্ভুক্ত হলেন এক

তরুণ সমাজতন্ত্রী ব্যবহারজীবী—যাঁর নাম আলেকজানডার কেরেনস্কি। কেরেনস্কি বিভিন্ন মামলায় রাজবন্দীদের পক্ষে সওয়াল করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সদস্যও ছিলেন। সুবক্তা এবং আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ফেব্রুয়ারির এই রক্তপাতহীন বিপ্লব রাশিয়ায় নিয়ে এসেছিল নানা চিন্তাধারা, পরিকল্পনা, ভাবাবেগ, নানা স্বপ্নের বন্যা-প্রবাহ। দেশ তখন উৎসাহে ফেটে পড়ছে।

অস্থায়ী সরকারের কার্যাবলী

বক্তৃতা, ঘোষণা, আনন্দধ্বনি আর প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে নতুন সরকার অনেক অভিনব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রণের স্বাধীনতা, ধর্মঘট ঘোষণার অধিকার, তাবৎ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং যাবতীয় ধর্ম ও জাতিসমূহের সমানাধিকারের ঘোষণা করেন অস্থায়ী সরকার। সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং দেশের সরকার কী ধরনের হবে তা নির্ধারণের জন্য একটি কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি (প্রতিনিধিমণ্ডলী বা গণ-পরিষদ) হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এই সরকারকে সমর্থন জানান। স্বয়ং লেনিনও এক সময় বলেন—একটা সময়ের জন্য রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু শান্তিস্থাপনে অনিচ্ছা, আমূল ভূমিসংস্কারে অক্ষমতা, বিভক্ত শাসনকর্তৃত্ব প্রভৃতি নানা কারণে দেশে বিভ্রান্তি, বাদানুবাদ আর অস্থিরতার একটা ভাব ক্রমশ গড়ে উঠছিল।

এমন সময় জার্মান সরকারের আনুকূল্যে লেনিন পেত্রোগ্রাদে এসে পৌঁছলেন। ফিরে এসেই একটা বিবৃতিতে (*April Theses*) তিনি জমির আশু জাতীয়করণ, অনতিবিলম্বে যুদ্ধের অবসান, সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দাবি করলেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন—অস্থায়ী "বুর্জোয়া" সরকার বলশেভিক পার্টির কাছ থেকে কোনো সাহায্য, সমর্থন পাবে না। ১৯১৭-র অকটোবর মাসে কীভাবে লেনিন সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিপ্লবী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, কীভাবে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হল, সেসব খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রয়োজন নেই। অবশ্য তখনও অধিকাংশ সোভিয়েতই বলশেভিক-বিরোধী ছিল। বলশেভিকদের পক্ষে ছিল পেত্রোগ্রাদ ও অন্য কয়েকটি সোভিয়েত। তবে রাজধানীর অধিকাংশ সৈন্যদলের সমর্থন বলশেভিকদের পক্ষেই ছিল। নানাকারণ-সমাবেশে, দেশের টালমাটাল অবস্থায়, সংকটের ঘনায়মান পরিস্থিতিতে, ইচ্ছামন্ত্রের জোরে লেনিনের কুশলী নেতৃত্বে, অকটোবর বিপ্লব ঘটেছিল, ইতিহাসে যার নাম অকটোবর "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নামে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হল কমিউনিস্ট পার্টি। "সর্বাধিক স্বাধীন" (লেনিনের কথা) রাজ্যটির অস্থায়ী সরকারের সব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হল, কোনো-রকমে পালিয়ে গিয়ে কেরেনস্কি প্রাণ বাঁচালেন। যে লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ হল এই বিপ্লবে, সেই তত্ত্বেরই বিরোধিতা করেছেন মার্টভ আজীবন। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এবং মার্টভের অপূর্ব দূরদৃষ্টি এমনই যে, একদা পৃথিবী-কাঁপানো যে অকটোবর বিপ্লব রাশিয়ার কেরেনস্কি সরকারকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে টপকে এক লাফে-সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, ঘড়ির কাঁটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলা হয়েছিল, পিছিয়ে-পড়া, অপরিণত কৃষকসমাজকেও "সমাজতান্ত্রিক" করা যায়, তিয়াত্তর বছর সেই অভিনব পরীক্ষা চলেছিল, ভালোমন্দ মিশিয়ে। সেই পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটেছে পূর্বতন নানা সমাজতান্ত্রিক দেশে। প্রমাণ হল, মার্টভ আর সোস্যাল-ডেমোক্রেটদের বিচার কত উচ্চাঙ্গের এবং ইতিহাস-সমর্থিত।

মার্টভ সম্পর্কে আরও কথা

বলশেভিকবাদের পতনের যুগে রোজা লাক্সেমবুর্গ, কার্ল কাউটস্কির সঙ্গে মার্টভের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁরা সকলেই বলশেভিকদের মতাদর্শ আর রণকৌশল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মার্কসবাদের পীঠের উপর দাঁড়িয়ে। মার্টভ নাকি "বিশ্ব বলশেভিক-বাদ" বলে একটি বই লিখেছিলেন। তার ইংরাজি অনুবাদ কোথাও দেখি নি। এই বইটিতে ১৯১৮-১৯ পর্যন্ত লিখিত তাঁর প্রবন্ধাবলী সংগৃহীত হয়েছে। মার্টভ ছিলেন সাচ্চা "মার্কসবাদী", কিন্তু লেনিনবাদ-বিরোধী "মেনশেভিক" তাত্ত্বিক। মার্কসীয় শিক্ষার আলোকে তিনি রাশিয়ার বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করেছিলেন এবং এই পর্যালোচনায় বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে রাশিয়ার আন্দোলনের মিল-অমিলের বিচারও আছে। মার্টভের মস্ত বড়ো গুণ ছিল তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা। সেজন্য তিনি সুবিধামতো মত পালটান নি কিংবা দলবদল করেন নি। ক্ষমতার আস্বাদ তিনি পান নি। ক্ষমতার জন্য তিনি নিজের দর্শনকে বিসর্জনও দেন নি। ফলে বিদেশে, কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে, দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

রুশদেশে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলকে মার্টভ কী চোখে দেখেছেন? তিনি বলেছেন, মার্কস-কথিত প্রলেতারীয় বিপ্লবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মার্কসের চিন্তায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের এক বিশেষ তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা আছে। রাশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটেছিল তা শ্রমিকশ্রেণীর উন্নত, পরিপক্ক চিন্তা থেকে জন্মায় নি। এই বিপ্লব ঘটেছিল এমন এক অবস্থায় যখন রুশসমাজ যুদ্ধজনিত সংহতিহীনতায় আর অবসাদে ভারাক্রান্ত। যুদ্ধের আগে নানা দেশে, বছরের পর বছর, শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের বছরগুলিতে সমাজের ভাঙন, রণক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, অভাব-অনটন প্রভৃতি শ্রমিকদের চরিত্রভ্রষ্টতা ঘটায়। গ্রাম-থেকে-চলে-আসা অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এই চরিত্রভ্রষ্টতা আরও পূর্ণতা লাভ করে। এই প্রক্রিয়া যুদ্ধরত সব দেশেই ঘটেছিল যুদ্ধের আগে "আইডিয়া"-র (ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ) যে প্রভাব ছিল, তা ক্রমশ অন্তর্হিত হল। জান্তব প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ কর্মে লিপ্ত হল। এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হল যেন সব সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে অস্ত্রশক্তির জোরে। সোস্যালিস্টদের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী ছিলেন (জিমারওয়ালডে) তাঁরা পরাভূত হবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সমাধি রচিত হয়েছিল। যুদ্ধের সময় থেকেই মার্কসবাদের ভাঙন প্রত্যক্ষ হল—একদিকে রইল "সামাজিক স্বাজাত্যবোধ" (social patriotism), অন্যদিকে বলশেভিক-জ্যাকোবিনতন্ত্র (Bolshevik Jacobinism)। আর শাসকশ্রেণী-গুলি তাদের সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে গণধ্বংসলীলায়, লুণ্ঠন, বাধ্যতামূলক শ্রম প্রভৃতি কাছে লিপ্ত রইল। মার্টভ বলছেন, পিছনে-ফেরার এই সাধারণ অবস্থায় বিশ্ববলশেভিকবাদের উত্থান হল প্রকৃত সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের ধ্বংসাবশেষের উপরে। একদা প্লেখানভও বলতেন যে বিপ্লবের প্রয়োজনে সাময়িক-ভাবে বুর্জোয়াদের নির্বাচনী অধিকার (electoral rights) বাতিল করার প্রয়োজন হতে পারে। মার্টভ জবাবে বলেছেন, এ কাজ করা যেত যদি সমাজে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংস্থা থাকত (Institutional Democracy)। বলশেভিক মতাদর্শের কথাটা হল, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র "অভ্রান্ত সত্য"; অতএব যে জনসাধারণ বুর্জোয়াদের দ্বারা বিভ্রান্ত তাদের উপর সত্যটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বুর্জোয়া-দের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কেই অবহিত নয়। কাজেই প্রলেতারিয়েতের স্বার্থেই বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে এবং বুর্জোয়া পার্লামেনটকে ধ্বংস করতে হবে, ধ্বংস করতে হবে তথাকথিত স্বাধীন মুদ্রণব্যবস্থা, বুর্জোয়া প্রতিনিধিত্বমূলক সব সংস্থাকে।

মার্টভ বলেছেন, ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের এক বিশেষ ধারার সঙ্গে এই মতবাদের সঙ্গতি আছে। যেসব ব্যবস্থাদি বলশেভিকরা প্রবর্তন করেছে, অনুরূপ ব্যবস্থাদি ব্যাবিউফ (Babouvists) উইট্‌লিং (Weitling), ক্যাবেট (Cabet) অথবা ব্ল্যাংকি-পন্থীদের (Blanquists) কর্মসূচীতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এ সবই মার্কসের দর্শনের পরিপন্থী।

নয়া অর্থনীতির (N.E.P.) আমলেও বলশেভিক-দের নতুন সমাজ গঠনের নীতিটা ছিল এরকম ;—একদিকে প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক জ্ঞান, অন্যদিকে নিপীড়ন ও ভীতিপ্রদর্শন। ইতিহাস একথা বলে না যে ওই সময় রাজনৈতিক ও পুলিশি সন্ত্রাসের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি ঘটেছিল। লেনিনের অভিপ্রায়ও মোটেই তা ছিল না। বলশেভিক-বিরোধী যে মুদ্রণব্যবস্থা গৃহ-যুদ্ধের সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়, "নেপ"-আমলেও সংবাদপত্রের উপর সেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। মেনশেভিক ও সোস্যাল-রেভোলিউশনারি পার্টির (S.R.) মতো বিরুদ্ধবাদী দলগুলিকে ভীতি প্রদর্শন করে নির্মূল করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অটোনমি বা স্বশাসন লোপ পায় ১৯২১ সালে। বুর্জোয়া সমাজে সাধারণ মানুষের ছাপাখানা নেই, সভা করবার মতো ভালো সভাগৃহ নেই—এই যুক্তি দেখিয়ে লেনিন ভাষণে, বক্তৃতায়, লেখায় বলতে থাকেন যে, সংবাদপত্রের তথাকথিত স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করবার স্বাধীনতা—সবই বুর্জোয়া ধোঁকাবাজি। যেহেতু সোভিয়েত ব্যবস্থায় জনসাধারণ এসব অধিকার পেয়েছে তাদেরই দেখতে হবে যে বুর্জোয়ারা এসব স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার অপ-ব্যবহার না করতে পারে। লেনিন বলতেন—মেনশেভিক ও এস. আর. (সোস্যাল-রেভোলিউশনারি পার্টি) বুর্জোয়া অধঃপাতে গেছে, সেজন্যই তাদেরও প্রলেতারীয় ডিক্টেটরশিপ মেনে চলতে হবে। ১৯১৯ সালে মেনশেভিক সংবাদপত্র বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে লেনিন বলেন, যে সময় সোভিয়েত সরকার জমিদার ও পুঁজিবাদী সৈন্যদের সঙ্গে চূড়ান্ত, রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, সেসময় যেসব লোক শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে একত্রে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি ছিল না, তাদের ওইসব স্বাধীনতা দেওয়া চলে না। ১৯১৯ সালে সোভিয়েত কংগ্রেসে মার্টভ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বলশেভিকরা শ্রমিকদের "সংখ্যালঘু" অংশেরই প্রতিনিধি। জবাবে লেনিন বলেন—"মার্টভ সাম্রাজ্যবাদের খ্যাপা জানোয়ারদের ভাষায় কথা বলছেন—ক্লিমেন্সো, উইলসন ও লয়েড জর্জের আদলে। 'He was speaking the language of the 'wild beasts' of imperialism—Clemenceau, Wilson and Lloyd George। উপসংহারে লেনিন তাই বলেছিলেন 'আমাদের সর্বদা সদা-সতর্ক থাকতে হবে এবং বুঝতে হবে যে চেকা (গুপ্ত পুলিশ) অপরিহার্য' (Volume 30, p 239)।

"ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেতারিয়েত" অথবা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের নামে লেনিনের অগণতান্ত্রিক কর্মধারার বিরুদ্ধতা কয়েছেন মার্টভ—সারাজীবন। অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের "অগণতান্ত্রিক" বিধিব্যবস্থার অবলুপ্তিতে তাঁর সম্মতি ছিল। যেমন পুলিশবাহিনী সেনাবাহিনী, কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র প্রভৃতি। কিন্তু, সাধারণভাবে "গণতন্ত্র" বিলোপের তিনি বিপক্ষতা করেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য বলতে মার্টভ কোনো সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে বুঝতেন না, বলতেন এটা হল একটা নতুন সমাজ। লেনিন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভাঙবার শ্লোগান দিয়ে কার্যত রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান করবার ব্যবস্থা পাকা করে গিয়েছিলেন।

কমিউনিজমের বিলয়ের পর, বর্তমান যুগে, সব প্রগতিশীল মানুষ—লিবারেল, ডেমোক্রাট, মানবিকতাবাদী, সবুজ সংরক্ষণপন্থী, ক্যাথলিক মানবতাবাদী, সব ধর্মের প্রবক্তা—যাঁরা মানুষকে মূল্য দেন, তারা সকলেই ক্রমশই এক হবেন। এ

যুগে লেনিনবাদের অবলুপ্তি হয়তো মানবপ্রগতির আর ঐক্যের দিক থেকে শুভ ফল নিয়ে আসবে। তখন মার্টভের চিন্তাধারার নবমূল্যায়ন হবে। কার্ল কাউটস্কি ও রোজা লাক্সেমবুর্গেরও।

অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯১৬ সালে। তিনি কলকাতার সিটি কলেজের দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির (W.B.C.U.T.A.) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি বহন করেছেন ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ সাল অবধি। অধ্যাপক চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে অধ্যাপক-প্রতিনিধি ছিলেন ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৬, একাদিক্রমে বারো বছর। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (তখনও পর্যন্ত অবিভক্ত) কার্ড-হোল্ডার। দর্শন, মার্কসবাদ ও রাজনীতি বিষয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তী "আনন্দবাজার", "দেশ", "পরিচয়", "চতুরঙ্গ", "নতুন সাহিত্য", "অগ্রণী", "সপ্তাহ", *Quest*, *Visva Bharati Quarterly* ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় এযাবৎ লিখেছেন শতাধিক প্রবন্ধ। এর থেকে নির্বাচিত কিছু লেখা নিয়ে একটি প্রবন্ধসংকলন প্রকাশের উদ্যোগ শুরু হয়েছে সম্প্রতি।

সম্মোহরাগিণী

সুকুমার চৌধুরী

সে এক বিরল ধ্বনি বেজে ওঠে কখনো-কখনো
নির্জনতা যখন তর্জনী তুলে নিসর্গকে বলে ওঠে 'চুপ'
আর নদী থেমে যায়, স্তব্ধ চরাচর, শুধু গোধূলি তখনো
তার ছেনালিতে রক্তময় করে রাখে অখণ্ড অরূপ।

সে ধ্বনি, সে সম্মোহরাগিণী, অপলক প্রগাঢ় বিজন
নির্লিপ্তি ও মোহিনীর নিথর প্রণয়, ধরে রাখো অনুভবে
কেন না এ সন্ধিক্ষণ অপ্রাকৃত কখনো-কখনো তার সম্মোহন
আমাদের হানে। শিল্প-অমরতা তাকে কে দিয়েছে কবে?

দ্রৌপদী অথবা মর্জিনা

ওমর আলী

বকরূপী ধর্ম কি কোথাও আছে এখানে আশেপাশে
এই মায়াসাগরের আশেপাশেই তার থাকার কথা…
কিন্তু দ্রৌপদী ভেসে আছে? পঞ্চপাণ্ডবের চারভাই
ভেসে আছে? নাকি জব্বার করিম খলিল হামিদ?
বঙ্গোপসাগরের কূলে ভেসে আছে তরুণী মর্জিনা
অবিকল যেন অমলিন দ্রৌপদীর লাবণ্য চেহারা
মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে রয়েছে শুধু চুলগুলো
মাথার পেছনে জলোচ্ছ্বাসের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে
সামান্য খানিকটা ছড়িয়ে পড়েছে
ও শোক ও মৃত্যু তুমি অপলক চোখে চেয়ে দেখো
বাঁশখালি অথবা হালিশহর থেকে ভেসে
এসেছে তরুণী কিন্তু নোনা পানি সামান্য একটুও
ওর দেহকে অগোছালো করে নি কী মসৃণ মুখখানা
কোথাও লাগে নি একটু কাদা ওই ঠোঁটে ওই চুলে
ওই আঁটসাঁট গায়ের জামায় সামান্যতম দাগ নেই
মা আনোয়ারা হঠাৎ কখন এসে ডাক দেবে
'মর্জিনা, ওঠ রে কত বেলা হয়ে গেছে আর কত ঘুমাবে'
কিন্তু মর্জিনার এই ঘুম আর ভাঙবে না কোনোদিনও না
ওর ত্বকে আর-একটু পরে পচন ধরবে ও দুর্গন্ধ হবে
ওর শরীরের কাঁঠালিচাঁপার সুগন্ধ কোথাও চলে যাবে
ওর চুলগুলোর আতর সৌরভ আর কি থাকবে?
চুলগুলো আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে খসে পড়ে যাবে
ও পসিডন ও বরুণ ও পবন মর্জিনাকে দেখো—
বকরূপী ধর্ম দেখো দ্রৌপদী আবার ভেসে আছে ঘুমাচ্ছে ঘুমাচ্ছে

বাংলাদেশ

তোমার পায়ে বাজুক

প্রীতিভূষণ চাকী

জোনাকি-ছড়ানো একটা দীঘল রাত
তোমাকে উপহার দিয়েছিলাম,
এখন ধীরে-ধীরে শুনতে থাকো
রাতের কোটরে লুকিয়ে রাখা আজান।

একটা ঝিনুক এইমাত্র বুকে করে নিয়ে গেছে
স্বাতী নক্ষত্রের একফোঁটা জল
সে আর প্রকাশ্যে দেখা দেবে না;
মহাজাগতিক রশ্মির দিকে তাকিয়ে
সে মুক্তো তৈরির কাজে
নিয়ত ব্যস্ত থাকবে,
এই ঝিনুকের তৈরি মুক্তোর আঙটি
তোমার অনামিকায় তুলে দেব,
ততক্ষণে তোমার পায়ে বাজুক
মৌমাছির নিঃশব্দ নূপুর।

গৃহবধূর আত্মহত্যা

ঊর্মিলা চক্রবর্তী

ঝুপসি অন্ধকার
জানলার গরাদ ধরে ওত পেতে ছিল
কালো বেড়ালের মতো।

লক্ষ রাত ঘুমছাড়া
প্রতীক্ষায় টানটান শিরাধমনীতে
অবসাদ রোগজীবাণুর মতো।

আলোর মুখোশ ছিল,
ফুল, হাসি, রঙ দিয়ে মাখা ছিল
বেসামাল আমোদের রাত;
আলতা-পরা পা-দুখানা ঘরের মেঝেয় রেখে
মমতায় গড়া মেয়ে হঠাৎ দেখেছে,
কোথাও মানুষ নেই।
সেই প্রথম রাত্তিরে
দেয়ালে ঠেকিয়ে পিঠ
ভয়ানক একা এক মেয়ে
বিস্ফারিত চোখে দেখেছিল
জানলার গরাদ ধরে
ডাইনির থাবার মতো ওত পেতে ঝুপসি অন্ধকার।

তারপর না-মানুষী নতুন সংসারে
মানুষের মেয়ে
শিলে ছেঁচে দিয়েছে নিয়ত
গোটা শরীরের ভোগ।

কড়িকাঠ থেকে নীল অবশেষ
আজ ভোরে পুলিশ নামিয়ে নিল।
ছড়ানো ছেটানো ছেঁচা মাংস, দলা রক্ত
ততক্ষণে সাফ।
মুখ মুছে সভ্যভব্য ঘর
সবার অলক্ষ্যে
চোখ টিপে ডেকে নিল
আত্মার আত্মীয় অন্ধকার।

ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির

সুধীর চক্রবর্তী

[পঞ্চম কিস্তি]

পাকিস্তান আমলে বাউলসম্প্রদায়ভুক্ত বলে প্রসিদ্ধ লালন শাহকে মুসলমানবংশোদ্ভূত এবং সুফি ধান্দানের পরম্পরায় ভুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ করলে ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তির অন্য কথাও মনে পড়বে। মনে পড়বে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত মোহাম্মদ ইয়াকুব আলীর লেখা "মুসলমানের জাতিভেদ" বইটির প্রসঙ্গ। সেখানে লেখক ১৯১১ সালের সেনসাস রিপোর্টে নানা শ্রেণী-পংক্তিতে বিভক্ত করে মুসলমান সম্প্রদায়কে দেখানোর প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন: 'জগতের মুসলমান সমষ্টিতে এক মুসলমান জাতির সৃষ্টি হইয়াছে: এবং মুসলমানদিগকে এই একজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতিতে বিভক্ত করা চলে না, ইহা সেনসাস কর্তৃপক্ষের জানা থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যদি মুসলমানগণকে শেখ, সৈয়দ, মীর, মোগল, পাঠান প্রভৃতি আখ্যানুসারে বিভাগ করাই একান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে এই পাঁচটী মুসলমানী উপাধি ব্যতীত জোলা, নিকারী প্রভৃতি মুসলমানেতর আখ্যায় বিভক্ত করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।' এই পর্যন্ত পড়ে পাঠকদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে ১৯১১ সালের আদমসুমারি প্রতিবেদনে মুসলমানদের জাতিভেদের সম্পূর্ণ তালিকা কী ছিল। মোহাম্মদ ইয়াকুব আলীর বই থেকে তা পেশ করছি।

১. আবদাল ২. আজলাফ ৩. আখুছি ৪. বেদিয়া ৫. বেহারা ৬. বেলদার ৭. ভাট ৮. ভাটিয়া ৯. চাটুয়া ১০. চুরিহর ১১. দফাদর ১২. দাই ১৩. দর্জি ১৪. দেওয়ান ১৫. ধাওয়া ১৬. ধোবা ১৭. ধুনিয়া বা ধুনকর ১৮. ফকির ১৯. গাইন ২০. হাজ্জাম ২১. জোলা ২২. কাগাজি ২৩. কালান ২৪. কান ২৫. কাসবি ২৬. কসাই ২৭. কাজি ২৮. খাঁ ২৯. খোন্দকার ৩০. কলু ৩১. কুমার ৩২. কুঁজরা ৩৩. লালবেগী ৩৪. মাহিফেরুশ ৩৫. মাহিসল ৩৬. মাল্লাহ্ ৩৭. মল্লিক ৩৮. মসালচি ৩৯. মেহ্তর ৪০. মীর ৪১. মির্জা ৪২. মুচি ৪৩. মোগল ৪৪. নগর্চি ৪৫. ননিয়া বা নন্নুয়া ৪৬. নাস্যা ৪৭. নাট ৪৮. নিকারী ৪৯ পাঠান ৫০. পাওয়ারিয়া ৫১ পীরকোদালী ৫২. রাঙ্গুয়া ৫৩. সৈয়দ ৫৪. শেখ ৫৫. সোনার।

৫৬. অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি—(ক) আফগান (খ) আশরাফ (গ) বাকলি (ঘ) বাখো (ঙ) বাড়ি (চ) ভুঁইয়ে (ছ) চৌধুরী (জ) চুনারী (ঝ) দফালি (ঞ) গড্ডি (ট) গোলাম (ঠ) হালালখোর (ড) হিজরা (ঢ) হোসেনী (ণ) খরাদি (ত) কোরেশী (থ) লাহেরী (দ) মাংটা (ধ) মেহানা (ন) মীরদেহ্ (প) মিরিয়াসিন (ফ) মিঞা (ব) নওমোসলেম্ (ভ) পাটেয়া এবং (ম) সুন্নি।[১]

"মুসলমানের জাতিভেদ" বইটির আখ্যাপত্রে লেখা আছে:

> কতকগুলি অমুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়া পবিত্র ইসলাম-অঙ্গে পীরপরস্তি, পৌত্তলিকতা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি যেসব গলদ ঢুকিয়াছে, সংস্কারের সম্মার্জ্জনীর চোটে তাহা দূর করিয়া পুনরায় প্রকৃত ইসলামী যুগের আবাহন করিতে হইবে।

"নিবেদন" অংশে বলা হয়েছে:

> সাম্যবাদ ইসলামের শ্রেষ্ঠ দান। সেই সাম্যবাদের অনুচর মুসলমানগণ বিধর্ম্মীর প্রভাবে বর্ত্তমানে এদেশে উচ্চ-নীচ, আশরাফ-আতরাফ এবং রজিল ও নজীব প্রভৃতি বিদ্বেষ-মূলক ভেদাভেদ নির্ণয়ে উন্মুখ হইয়া মুসলমানের এমন শান্তিপ্রিয় সঙ্ঘবদ্ধ সমাজকেও ধ্বংস মুখে লইয়া চলিয়াছেন।

তাহলে বোঝা গেল, কেবল আদমসুমারির কর্তৃপক্ষ নন, জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদের সমস্যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন। সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মে জাতি-বৈষম্যের কাঁটা (যে প্রভাবেই হোক) বিশ শতকের মুসলমান সমাজকে চিন্তিত করেছিল। "গলদ" যে ঢুকেছিল এবং "সংস্কারের সম্মার্জনী" প্রয়োজন হয়েছিল তারও স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এখানে অনুক্ত থাকলেও গলদের মূলে আসলে যে লালনোত্তর কালের বিপুলসংখ্যক মারফতি ফকিরদের শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ ও প্রভূত লোকপ্রিয়তা, বিশেষত নিম্নবর্গের মুসলমান সমাজে, তাতে সন্দেহ নেই। লালনের মৃত্যুকালে শিষ্যসংখ্যা ছিল দশ হাজারের বেশি। উচ্চবর্গের মুসলমান লেখক মৌলভী আবদুল ওয়ালি ১৮৯৮ সালে ফকিরদের সম্পর্কে ঘৃণার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাদের জীবন হল 'a life of abomination, of guilt, of shame, and of filth, for the purpose of subverting the existing order of things'।

আবদুল ওয়ালি নিজেই নিম্নবর্গের বা নিম্নজাতিস্তরের মুসলমানদের কথা বলে গেছেন এমনতর পরিষ্কার ভাষায় যে,

> The illiterate, the lowly Hindus and Muhammadans are the classes from among whom these Faqirs and mendicants are generally recruited...So far as I am aware, these beliefs were formerly confined to a class of Hindu Tantrics and Bairagis of the Baula order, but since a period of 30 or 40 years men of other castes, e.g., Musalmans of the lower order, are believing in their satanic beliefs.

বাঙালি মুসলমান সমাজের জন-ইতিহাসের এই সংকট উচ্চবর্গের চোখে এতক্ষণ দেখা বা দেখানো হল। এবারে নিম্নবর্গের একজন বাউল ফকির দুদ্দু শাহ্-র জবানিতে শোনা যেতে পারে বিদ্রূপমুখর প্রতিবাদী ভাষ্য, একটি গানে:

> এ দেশেতে জাত বাখানো সৈয়দ কাজী
> দেখি রে ভাই—
> যেমন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সবাই।
> ব্রাহ্মণের দেখাদেখি
> কাজী খোন্দকায় পদবী রাখি
> শরীকী কওলার ফাঁকি
> দিয়ে সর্বদাই।

জোলা কলু বা জমাদার যারা
ইতরজাতি বানায় তারা
এই কি ইসলামের শরা
করিস তারই বড়াই ?

এ তো মর্মান্তিক প্রশ্ন, একেবারে একিলিসের গোড়ালি বিদ্ধ-করা ! সৈয়দ খোন্দকার কাজীরা যখন জোলা-কলু-জমাদারদের ইতরশ্রেণীভুক্ত (অর্থাৎ মুসলমানেতর) করেন তাতে কি শরিয়ত রক্ষা পায় ? এসব থেকে বোঝা যায় লড়াই তাহলে ভেতরে-ভেতরে একটা ছিল। বাংলাদেশের হালের সমাজবিজ্ঞান-গবেষিকা সুলতানা আফরোজ তাঁর "জাতিভেদপ্রথা ও বাংলাদেশের বাউল সমাজ"[২] বইতে কয়েকটা স্তোক মন্তব্য করেছেন। যেমন—

১. বাউলদের সাথে আলাপ-আলোচনায় আমার ধারণা জন্মেছে যে, এরা মূলত একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী, যার উৎপত্তি সাধিত হয়েছে এক প্রতিবাদী মনোভঙ্গির কারণে। জাতিভেদপ্রথা এই প্রতিক্রিয়ার মূলে। সমাজে লাঞ্ছিতহবার কারণে এরা নিজেরাই তাদের সমাজ গড়ে তুলেছে।

২. বলা যেতে পারে বাউলসমাজ জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্যের একটি প্রত্যক্ষ ফসল।···মুসলমান রাজন্যবর্গের সহায়তায় সৈয়দ, সেখ, মুঘল পাঠান উচ্চবর্ণে স্থিতি লাভ করে এ দেশের ধর্মান্তরিত অগণিত মানুষদেরকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত রেখেছে।

৩. আমার ক্ষেত্র গবেষণায় আমি লক্ষ্য করেছি যে ইসলামধর্মে যদিও হিন্দুধর্মের মতো কোনো জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত নেই তবে মুসলিম-সমাজে শ্রেণীভেদ প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীভেদ যেমন আশরাফ (উচ্চবর্ণ) এবং আতরাফদের (নিম্নবর্ণ) আবার তেমনি আতরাফদের নিজেদের মধ্যেও তা প্রচলিত।

৪. লালনশাহীদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদেরকে বাউল এবং জাতিধর্মহীন বলে উল্লেখ করে। সম্প্রতি লালন মাজারে "মিলাদ শরীফ" অনুষ্ঠিত হওয়াকে কেন্দ্র করে বাউলেরা জেলা প্রশাসনের নিকট প্রতিবাদ জানায় এবং নিজেরা ইসলাম-ধর্মাবলম্বী বা মুসলমান নয় বলে দাবী করে।

এইসব তথ্যবহুল সমাজ-ইতিহাসের পটে স্থাপন করে এবারে শোনা যাক লালন ফকিরের নামে প্রচারিত এক চমকপ্রদ গান। লালন স্বপ্ন দেখছেন—

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে—
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে না দেবে।
আমির ফকির হয়ে একঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে।
ধর্ম কুল গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মোরে দেখায়ে দেবে।[৩]

গানটির মর্মবাণী খুব প্রাণস্পর্শী ও আধুনিক, কিন্তু কোনোভাবেই যে এই গান লালনের রচিত নয়, তা সুনিশ্চিত। এই নিশ্চিতির কারণ দুটি। প্রথমত, কোনো আদর্শ লালনগীতি-সংকলনে গানটি নেই ; দ্বিতীয়ত, এ-গানের অন্ত্যমিল আর শব্দবিন্যাস একেবারেই লালনবর্গের নয়। তবু কেন প্রসঙ্গত গানটি আমি উদ্ধৃত করলাম তার স্পষ্ট যুক্তি আছে। আমি বোঝাতে চাই, এ গান মারফতিদের পক্ষের কারুর বক্তব্যবহুল রচনা। লালনের ভণিতা থেকে সন্দেহ হয়, গীতিকার লালনপন্থী। সেটাই স্বাভাবিক। এই গান প্রমাণ করে লালনের বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয়ের ও সাম্যভাবনার অস্তিত্ব। তাঁকে সর্বতোভাবে মিস্টিক দেহতত্ত্ববাদী না ভেবে যদি সমাজ- ও জাতিবর্নসচেতন

ভাবুক স্রষ্টা ভাবি, তবে বুঝতে সুবিধা হয় কেন একজন লালন-পরবর্তী গীতিকার এমন গান লেখেন। গানটির গভীরে লালনের অচরিতার্থ স্বপ্নের সম্প্রসারণ রয়েছে। ইতর আতরাফদের অসহায় জীবনযাপন এবং আশরাফদের উচ্চবর্গজাত অহমিকা তাঁকেও বিদ্ধ করেছিল এবং আজও মারফতিদের সঙ্গে উচ্চবর্গের লড়াই থামে নি। বরং ইসলামি রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশে আশরাফ সম্প্রদায় ও শরিয়তের দাপট অনেক বেশি, মারফতিদের বিপন্নতাও মর্মান্তিক। দুটি প্রমাণ হাজির করছি। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত "আল সাদীদ" পুস্তিকার শেষে লেখক আতিয়ার রহমান জানিয়েছেন : 'সমাজবাদ-মার্কসবাদ-ওয়াশিংটনবাদে বাংলার মুক্তি নেই। বৃহত্তম মুসলিম জাতির দেশ—এই বাংলাদেশে শরীয়তী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাতেই দেশ ও জাতির উন্নতি নিহিত রয়েছে।' এই বক্তব্যের পিঠোপিঠি তথ্য রয়েছে ম. আ. সোবহান রচিত "জালালী ফয়সালা" বইতে। সেখানে লেখক আহ্বান জানিয়েছেন, লালনের মাজার ধ্বংস করা হোক। এই সোবহান সাহেব ১৯৮৬ সালে কুষ্টিয়ায় 'পীর মুরিদী অবৈধ" বলে যে ভাষণ দেন তার মুদ্রিতরূপ বড়ো উগ্রপন্থী। তাঁর বক্তব্য :

আমরা এমন একটা দেশের বা অঞ্চলের মুসলমান যে ভূখণ্ডে পীর-মুরিদী কলমিলতার মতো ছেয়ে গেছে অনেক কাল হতেই।···আপনারা জানেন যে আমি একজন বিতর্কিত লোক। পীর-মুরিদী, মিলাদকিয়াম, ইছলেছওয়াব, ওরশ ইত্যাদি বেদাতের বিরুদ্ধে কঠিন যুক্তি ও বাহাছ চালিয়ে যাচ্ছি আজ অর্ধযুগ ধরে। বাংলার বুকে এমন পীর নেই যে আমি তার বিরুদ্ধে বাহাছ করিনি। ফুরফুরার পীরদেরকে আমরা পাল্টি, ভাইলা, মুখীপুর-ভূতুবপুর, কীর্তিনগর এবং যশোরের বেনিপুর হতে মুকাবিলা করে হটিয়ে দিয়েছি। আজকের সবচেয়ে বড় পীর সরকারি পীর অর্থাৎ জবরদস্ত গরুখোর আটরপীর পীরের প্রায় এক ডজন আলেমদের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ার শহরতলী জুগিয়া গ্রামে বাহাছ করেছি। এই বাহাছেতাদের যে কি ন্যাক্কারজনক অবস্থা হয়েছিল তা আপনারা অনেকেই দেখেছেন। ···অনেককে দাড়ি চেঁছে পলায়ন করতে হয়েছে। শম্ভুগঞ্জের পীর, রাজশাহীর ওলাউলাহ্ পীর, বগুড়ার পীর, দহ-গ্রামের পীর, রংপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, ঢাকা, টুঙ্গী এলাকার এবং বিশেষ করে পাবনা জেলার সকল পীরদের বিরুদ্ধেই আমার মুকাবিলা হয়ে গেছে।

রাষ্ট্র যেখানে শরিয়ত-সমর্থক সেখানে "বেশরা" বা মারফতিদের যে "দাড়ি চেঁছে" পালাতে হবে সে তো স্বাভাবিক। ব্রিটিশ আমলে এমন দৈহিক শক্তি-প্রয়োগের সুযোগ ছিল না, কিন্তু বেশরাদের বেদাতি কার্যকলাপ সম্পর্কে ক্ষোভ আর উষ্মার শেষ ছিল না। তার প্রমাণ পাই "বাউল ধ্বংস ফৎওয়া" (১৯২৫) বইয়ের বক্তব্যে। সেখানে বলা হয়েছে :

বাউল ন্যাড়ার দল পবিত্র এছলামের ভিতর দিয়া যে কুৎসীত জঘন্য "মত" গজাইয়া তুলিয়াছে ও পবিত্র শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ও মোছলমান দলভুক্ত থাকিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে তাহাদের কোফরী মত সমূহকে বিস্তার করতঃ পবিত্র এছলামকে ধ্বংস করিতেছে ও মোছলমানের দেরবেশ, অলি সাজিয়া মোছলমানকে ধোকায় ফেলিতেছে এমতাবস্থায় যদ্যপি মোছলমান বাদশাদের রাজ্যে তাহাদের বাস হইত তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা যাহা ঘটিত তাহা তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিলেই মোছলমানের দেরবেশ, অলি হওয়ার সাধ মিটিয়া যাইত। সুতরাং আমাদের ইংরেজ রাজ্যে বাস, তাহারই আইন কানুন অনুসারে আমাদিগকে চলিতে হয়। এজন্য পবিত্র শরীয়তের এই সকল শাস্তিজনক বিধান এদেশে প্রচলিত নহে। কেবল আমরা পবিত্র শরীয়তের বিধানগুলি অবগত হইয়া ও বাউল ন্যাড়াদের মনগড়া মোছলমানি ও

শাহ ফকিরির দাবীর মাপকাটির পরিচয় পাইয়া বৃটিশ আইনের মর্ম্মকে রক্ষা করতঃ শান্তিভাবে তাহাদের দল হইতে সকল প্রকার সামাজিকতায় সরিয়া থাকা উচিৎ।

বাউল-ফকিরদের বরাবরই বর্জন করেছে উচ্চবর্গের শরিয়তি সমাজ। প্রায় শ্রেণীস্থানার পর্যায়ে পড়ে সেই বর্জনপন্থা। লালনের সমসাময়িক গীতিকার পাগলা কানাই যখন মারা যান, তখন তাঁর কবর দেবার সময় কোনো মৌলবী জানাজা পড়তে অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আজও বাউল-ফকিরদের অন্তিম কাজে জানাজা-র ব্যবস্থা নেই। এটা তাঁদের প্রতিবাদের একটা ধরন। লালনের অন্ত্যেষ্টিতে ইসলামি রীতি মানা হয় নি।

লালনবিরোধীরা লালন ও তাঁর মতবাদকে বারবার "নাড়া"-র ধর্ম বলেছেন এবং নিন্দা করেছেন। উচ্চবর্গের ইসলামি সমাজ বাউল-মারফতিদের নেড়া, নাড়া বা ন্যাড়া কেন বলতেন তা বোঝা কঠিন। একজন ন্যাড়া বলতে বুঝেছেন ন্যাড়ানেড়ি। আরেকজন তাঁদের নরপশু বলেছেন। নাড়া বলতে আরেকজন বুঝেছেন উৎসহীন (rootless) মতবাদ। আবদুল ওয়ালি বলেছেন :

> The etymology of Nārā is uncertain. There are Nārās both among so called Muhammadan Faqirs and Hindu Bairagis. Some say the founder of the order used to place nārā (stubble) in his wallet, which (nārā) he used to move, and upon which he used to sit.

বাউলতত্ত্ববিদ্ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন : 'ইহারা (ফকিররা) জাতিতে মুসলমান হইলেও নেড়াদের মতো অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধসাধকদের মতো ধর্মাচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে নেড়ার ফকির বলা হয়।' এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বাউলদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে কিছু নতুন চিন্তা পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, বাউল-ফকিরদের দীক্ষা বা "বেশ"-ধারণের পর সৃষ্টির দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। জন্মের ঘরে শূন্য, তাই তাঁদের "নাড়ার ফকির" বলা হয়। চলতি কথায় বাউলরা সব "নাড়া-খাড়া"। তবে "নাড়ার ফকির" কথাটি মৌলবাদী ও ভদ্রসমাজের লোকজন অবজ্ঞাসূচক তুচ্ছার্থে গালি হিসাবে ব্যবহার করেন।

লালন তাঁর গানে "নাড়া" কথাটি উল্লেখ করেছেন কয়েকবার। তেমন একটি উদাহরণ হল :

কুলের বউ হলাম ভারি হলাম নাড়ি নাড়ার সাথে।
নাড়ার সাথে হয়ে নাড়ি পরনে পরেছি ডুরি
দিব না আঁচির কড়ি বেড়াব চৈতন্যপথে॥
ভাবের নাড়ি ভাবের নাড়া
কুল মজান জগৎজোড়া
করণ তাহার দৃষ্টিছাড়া
বিধির ফাঁড়া কাটবে যাতে॥
আসতে নাড়া যেতে নাড়া
কেবল দুদিন হুড়াজুড়া
লালন কয় আসল গোড়া
জেনে হয় মাথা মোড়াতে॥

আরেকটি গানে আছে :

দিস্‌নে আঁচির কড়ি
নেড়া নেড়ি হও যে-রে
তুই থাকবি ভাল
পরকাল যাবে দূরে॥

মনে হয় এককালের নেড়ানেড়িদের প্রতি অবজ্ঞা থেকে "নাড়া" বলা হত ফকিরদের। কিন্তু বাউল-ফকিররা কখনই মুণ্ডিতমস্তক নন, "সর্বকেশরক্ষা" তাঁদের রীতি ও কৃত্য। যাই হোক, বিশ শতকের কট্টর মুসলিম সম্প্রদায় লালনকে বারবার "নাড়া" বলেছেন হীনার্থে।

লালন ফকির ও তাঁর প্রয়াণপরবর্তী কালে বাউল ফকিরসমাজ সম্পর্কে উচ্চবর্গের আলেম, মৌলভী ও শরিয়ৎবাদীদের অবিশ্রান্ত শত্রুতা স্পষ্টত বুঝিয়ে দেয় লালনতত্ত্বের প্রবল পরাক্রম ও জনপ্রিয় গ্রহণীয়তাকে।

তাঁর মত ও পথে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে অটলব্রতী। শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মুসলমানকে তিনি নিজের বিশ্বাসের জগতে সহব্রতী করেন নি। ফলে লালন-মতবাদের গ্রহণযোগ্য সমর্থন ও ভাষ্য উচ্চসমাজে বিস্তৃত হতে পারে নি। কুষ্টিয়া ও যশোহরের আশেপাশে নিঃসঙ্গভাবে এইসব বাউল ফকির তাঁদের গোপ্য সাধনার মগ্ন ধারাকে বয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু কোনো কারণে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেন নি। তার একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এখানে মনে পড়ে। যশোহরের মারফতি সাধক ও বিখ্যাত গীতিকার পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪) প্রথমে লালন-স্রোতের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু লালনপন্থার জন্মরোধের সাধনা থেকে স্খলিত হন তিনি। সন্তানজন্ম ঘটার ফলে পাঞ্জু শাহকে লালনস্রোত থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় এবং তিনি যশোহরের আলমপুরে নিজের সাধনার এক স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি করে নেন। আজও এই দুই সাধনার স্রোতে মিলন ঘটে নি। বাংলাদেশের লোকায়ত ধর্মসাধনার প্রবহমান ধারায় লালনশাহী ঘর ও পাঞ্জুশাহী ঘর এখন দ্বিধাবিভক্ত দুটি তরঙ্গ। একটি ছেঁউড়িয়ায়, একটি আলমপুরে। উভয় সম্প্রদায়েই হিন্দু-মুসলমান আছেন। সুলতানা আফরোজের সরেজমিন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় পাঞ্জুঘরের ভিত্তিতে আছে সুফিবাদ, লালনঘরের ভিত্তিতে বাউলতত্ত্ব। 'পাঞ্জুশাহী এবং লালনশাহী ঘরের মধ্যে বিবাহ সাদী হয় না।...গোঁড়া মুসলমানরা তাদেরকে মুসলিমসমাজ বহির্ভূত বলে ভাবেন।' তবে একথাও উল্লেখ্য যে ১লা কার্তিক (লালনের মৃত্যুবার্ষিক) এবং ফাল্গুনমেলায় ছেঁউড়িয়াতে সব বর্গের বাউল ফকির সমবেত হন। তখন পাঞ্জুশাহী ঘর ও লালনশাহী ঘর বর্ষার বন্যার মতো কূপজল ওনদীরজলকে মিলিয়ে দেয় এক ভাবস্রোতে। গানের বাণীতেও লালন ও পাঞ্জু শাহের মিল কি কম? পাশাপাশি দুটি গান দেখবার মতো।

১. লালন বলে হাতে পেলে
জাত পোড়াতাম আগুন দিয়ে।
২. জাতের বড়াই কি
ইহকাল পরকালে জাতে করে কি—
আমার মন বলে অগ্নি জ্বেলে দি
জাতের মুখি॥

দুজনেরই চোখে ছিল জাতিসমন্বয়ের স্পষ্ট এক মানবিক স্বপ্নময়তা।

লালনের জীবনস্বপ্ন ছিল নিঃসঙ্গ। তিনি নিম্নবর্গের কৃষিজীবী মানুষদের যেমন কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস থেকে জীবনের দেহগত চর্যায় টানতে চেয়েছিলেন, তেমনই তাদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রের আচরণসর্বস্ব অনুসরণ ও অনুমানবহুল ঈশ্বরধারণা থেকে। তখনকার পরাক্রান্ত সমাজপ্রতিকূলতা তাঁর প্রতিবন্ধক হয়েছিল। তবু তাঁর ব্যক্তিগত সাধুতা ও জীবনের যাপনগত গভীর নিষ্ঠা এবং অসামান্য গানরচনার প্রতিভা সমকালে লালনকে এক ধরনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সংঘ বা সংগঠনের প্রয়াস ছিল না। শেষ মধ্যযুগের সেই ধূসর গ্রামীণ সমতলে লালন যেন এক ঋজু বৃক্ষের মতো উঠে গিয়েছিলেন ঊর্ধ্বস্তরের চেতনায়। তাঁর গান সেই ঊর্ধ্ব মানসের উচ্চারণ। সেই গানের মহান উত্তরাধিকার নেবার মতো বড়োমাপের সাধক সে সময়ের ওই অঞ্চলের গ্রামীণ বাঙলায় ছিল না। ফলে তাঁর প্রয়াণের পর খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও মন্দপ্রতিভার অনেকে লালনের গান গেয়ে চলেছেন, কিন্তু লালনদর্শনের নিগূঢ়তা বা তাঁর জীবনপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা বাউলসমাজে সুপ্রোথিত হয় নি। গানের ধারা বেয়ে লালনপন্থীরা তাঁদের নিঃসঙ্গ একতারার একটি তারে অত বড়ো মাপের গানের বেদনাকে ধরতে পারেন নি। ফলে আজ আমাদের চোখে লালন যেন এক মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব, যাঁর কোনো ধারা পরিণাম নেই। এমনটা হত না, যদি লালন তাঁর বাউলদর্শনে পেয়ে যেতেন কোনো শিক্ষিত ভদ্রজনকে। তখনকার সমাজপরিবেশে বাউলজীবন ছিল অচ্ছুত, ঘৃণ্য, নিম্নবর্গীয়। অথচ সেই নিম্ন-

বর্গের মধ্যে উচ্চচেতনাসম্পন্ন লালনের পক্ষে অনিবার্য ছিল সঙ্গহীনতা। তাই তাঁকে অতল সন্তাপ থেকে গাইতে হয়েছিল—

কারে বলব আমার মনের বেদনা
এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলে না।
যে দুখে আমার মন
আছে সদাই উচাটন
বললে সারে না॥

এই দোসর জনের জন্য ব্যথাবেদনা যতটা সাধকের, তার চেয়ে অনেক বেশি একজন স্রষ্টার। বিশেষ করে সেই স্রষ্টার যিনি একটা নতুন পথ রচনায় ব্রতী। যাঁর লড়াই মন্ত্র, তন্ত্র, মন্দির, উচ্চবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। জীবনের অনেক পর্বে রবীন্দ্রনাথকেও কি নিতে হয় নি এমন সঙ্গহীনতার নির্জন? কিন্তু তিনি ক্রমেই পেতে শুরু করেছিলেন ব্রতী সহকর্মীদের, ছিল সুস্পষ্ট সাংগঠনিক লক্ষ্য। উনিশ-শতকীয় কলকাতা এবং সারাদেশের শিক্ষিতজনের নবচেতনা তাঁর সহায়ক ছিল। কিন্তু লালনের প্রতিবেশ ছিল একেবারে বিরুদ্ধ। আবদুল ওয়ালীর ভাষায় তিনি "existing order of things"-কে পালটাতে চেয়েছিলেন, স্রোতের বিরুদ্ধে। শরিয়তি ধর্মপ্রতিষ্ঠানের গরিষ্ঠতা সেই স্রোত। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধতা কি বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বকে প্রতিহত করে নি? সেই অনুপাতে লালনপন্থা তো এক শীর্ণতোয়া স্রোত।

ভারতীয় জন-ইতিহাসের নানা পর্ব-পর্বান্তর মনে রাখলে দেখা যাবে একমাত্র পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ভক্তি-আন্দোলনের সময় ছাড়া নিম্নবর্গের মধ্যে থেকে ভাবসাধক উঠে আসেন নি। এক প্রবল বন্যার কূলপ্লাবী বিস্তারে ভক্তিধারা ভারতীয় মধ্যযুগীয় মানসকে সিঞ্চিত করেছিল। কায়াবাদী সাধকরা নিজ শরীর থেকে জীবনসত্যের এমন আহরণ করেছিলেন, যা তাঁদের স্বচ্ছদৃষ্টি এবং শাস্ত্রবিরোধিতার অর্জনে পৌঁছে দিয়েছিল। এঁরা কেউ উচ্চবর্গের অভিজাত ধর্মধারণায় গ্রস্ত ছিলেন না। ভক্ত কবীর ছিলেন জোলা, রুইদাস ছিলেন চর্মকার, শুক্কহংস রজক। দাদু ছিলেন ধুনকর, রজ্জব কলাল বা মদ-বিক্রেতা, নামদেব ছিলেন ছিপী অর্থাৎ বসন রাঙাতেন। হীন জাতি বা বংশধারা এসব ভাবসাধকের জীবনে কোনো প্রতিবন্ধকতা আনে নি, বরং জগৎ ও জীবন এঁরা স্বাভাবিক সমতলে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের রচিত গানের বাণীতে এসে গেছে শাস্ত্রবিরোধিতা, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মানবপ্রেম এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনমন্ত্র। কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকের বাঙলায় উচ্চবর্গের প্রতিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে। কট্টর ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও শরীয়তি ইসলাম পথরোধ করতে চায় অনাবিল লোকায়ত জীবনের। তখনই জেগে ওঠে চৈতন্যপন্থায় নানা উপধর্ম। শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবদের চোখে এইসব গৌণ ধর্মের মানুষরা আখ্যা পান "ভণ্ড", "ভ্রষ্ট", "অনাচারী", "পাষণ্ড"। তার কারণ তাঁরা প্রচলিত পথে না-হেঁটে বেদবিরোধী শাস্ত্র-বিরোধী ধারা তৈরি করে নিজেদের মন্ত্র, সাধনপদ্ধতি এবং গান গাইতেন। এটা যখনই হয়, পুরোনো পথের বিরোধিতা করে নতুন পথের সন্ধান, তখনই প্রতিক্রিয়া ওঠে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মনেতাদের মনে। "existing order of things" বজায় রাখতে কে না চায়? রামলাল শর্মাও তাই "পাষণ্ডীদলন" পুঁথিতে রুষ্ট প্রশ্ন তোলেন :

কি জন্য প্রবীণ মতে বিরত হইয়া।
অভিনব মতে রত কি সুখ দেখিয়া॥
স্বর্গের সোপান কি এ মতে গাঁথা আছে।
দড়বড়ি চলি যাবে শ্রীহরির কাছে॥
না জানি কি লাগি সবে ভ্রান্ত হায় মতি।
নবপথে পদার্পণ কেন ও দুর্মতি॥

নবপথের সন্ধানী আউল-বাউল-ফকিরদের সাধনাকে শরিয়তবাদীরা "চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুহলিম সংস্করণ" বলেছেন। হিংসাবশে অপপ্রচার কতদূর যেতে পারে, তার একটি নমুনা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" থেকে উদ্ধৃত করছি।

লালন ফকির
নন্দলাল বসু-কৃত স্কেচ। সমীর ঘোষের সৌজন্যে

পীর ফকিরদের দেহলালসা ও লাম্পট্য প্রমাণের জন্য তিনি অনায়াসে লিখে দেন :

এই মুসলিম ভিক্ষোপজীবী নেড়ার ফকির দলের পুরোহিত বা পীরেরা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্রহরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যখন পীর তাহার মুরিদানের গ্রামে তশরিফ আনেন তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমারী উত্তমবসনে সজ্জিতা হইয়া বৃন্দাবনের গোপিনীদের অনুকরণে একটি গৃহকক্ষে পীরের সহিত মিলিত হয়।···পীর এখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।···কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ না করিয়া পীরের যৌনলালসা পরিতৃপ্ত করাই ইহাদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।[৪]

বাউলফকিরদের সম্পর্কে অপপ্রচার এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস কতটা জোরালো করে দেখানো হয়েছিল তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি রেয়াজউদ্দিন আহমদের বই থেকে—

বাউল ফকীরগণ পবিত্র কোরয়াণ হাদিছ পরিত্যাগ করতঃ যে মারফতি ফকীরের পরিচয় দিতেছে তাহা হিন্দু চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত। অতএব ইহারা মোছলমানের দোরবেশ ফকীর নহে। কতেক অশিক্ষিত মোছলমান উল্লেখিত চৈতন্যসম্প্রদায়-ভুক্ত উদাসীনগণের মত গ্রহণপূর্ব্বক মোছলমানের সাহ, ফকীর নামে পরিচয় দিয়া মোছলমান সমাজকে কলুষিত করিয়াছে। ইহারা মোছলমান

সমাজ মধ্যে থাকিয়া কতকগুলি মোছলমানি কথা ওচাল ও হিন্দু বৈষ্ণব উদাসীনগণের নিকট হইতে কতক কথা ও ভাব লাভ সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক হিন্দু সাজিয়া সরলপ্রাণ হিন্দুগণকে ধোকা দেয় ও অর্দ্ধেক মোছলমান সাজিয়া মোছলমান সমাজে ডিগবাজী করিয়া বেড়ায়।··· ইহারা এমন মারাত্মক ও সংক্রামক যে ইহাদের স্থান না শিক্ষিত মোছলমান সমাজে আছে না শিক্ষিত হিন্দু সমাজে। এই প্রবঞ্চক প্রতারক দলকে মোছলমান ও হিন্দু দুই সমাজ হইতে শৃগালের ন্যায় বিতাড়িত করা উচিত।[৫]

আবদুল ওয়ালি এঁদের জীবনযাপন সম্পর্কে বলেছিলেন 'a life of abomination, of guilt, of shame and of filth', আর রেয়াজউদ্দিন আরেক কাঠি বাড়িয়ে বললেন—"প্রবঞ্চক ও প্রতারক", শৃগালের মতো বিতাড়নযোগ্য। অবশ্য স্বীকার করলেন বাউলফকিররা "মারাত্মক ও সংক্রামক"। শিক্ষিত উচ্চবর্গের হিন্দু মুসলমান সমাজকে এঁদের সম্পর্কে সময়োচিত সতর্কীকরণটুকুও লক্ষণীয়। এসব অনুধাবন করলে বোঝা যায় কেন আকরম খাঁ তাঁর বইতে লালন-শাহের নীচের পদটি ক্ষোভের সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন—

পার কর চাঁদ গৌর আমায় বেলা ডুবিল।

ও চাঁদ গৌর এইসেছে, ও চাঁদ গৌর হে কুলে বইসেছে
আরও কুল-গৌরবিনী যারা কুলে থাকে তারা
ও কুল ধুইয়া কি জল খাইব?
ও চাঁদ গৌর যদি পাই ও চাঁদ গৌর হে।

আকরম খাঁ এক্ষেত্রে দুটি মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। প্রথমত, তিনি জানতেন না যে লোকায়ত কায়াসাধকদের কাছে কৃষ্ণ, রাধা, গৌর, বৃন্দাবন, নিত্যানন্দ জাতীয় শব্দের গুহ্য স্বতন্ত্র অর্থ, তাৎপর্য ও প্রতীক আছে। সুতরাং "ও চাঁদ গৌর যদি পাই" উচ্চারণে লালনের নিঃসন্দিগ্ধ বৈষ্ণবতা প্রমাণিত হচ্ছে না এবং সেই কারণেই মুসলমান সমাজের পক্ষে লালন কোনোভাবেই মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাচ্ছেন না। আকরম খাঁ-র দ্বিতীয় ভুল মূলত দৃষ্টিভঙ্গিগত। তাঁর প্রান্তবাদী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ একথা বোঝাতে পারে নি যে আঠারো-উনিশ শতকে হিন্দু মুসলমানের যৌথ সাধনায় একটা ধর্মসমন্বয়ের সচেষ্ট উদ্যম ছিল, বিশেষত কবি ও গীতিকারদের নানাবিধ রচনায়। আমরা কী করে ভুলব যে ওই শতাব্দীতেই কুবির গোঁসাই লিখেছিলেন :

১. রাধাকৃষ্ণ মোহম্মদ একাঙ্গ একাত্মা সার
২. অগণনায় বর্ণ লেখা
রাধাকৃষ্ণ যীশুখ্রীষ্ট খোদআল্লা এক
৩. আল্লা আলজিহ্বায় থাকে আপন সুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে

গীতিকার জালালুদ্দিন লিখেছিলেন :

১. রহিম করিম রাধা কালী
এ বুল সে বুল যতই বলি
শব্দভেদে ঠেলাঠেলি
হইতেছে সংসারে।
২. করিম-কিষণ হরি-হজরত লীলার ছলে ঘোরে-
ভাবে ডুবে খুঁজে দেখ
ভেদাভেদ কিছু নাই রে।

যাদুবিন্দু গোঁসাই লিখেছিলেন :

১. এ কুলআলম তোমারি ওহে কুদরত নিহারি
তুমি কৃষ্ণ তুমি কালী তুমি দিলওয়ারি।
২. তুমি এই মুসলমান তুমি এই হিন্দু।[৬]

তাহলে লালন ফকির এই সমন্বয়বোধ থেকে যখন লেখেন :

সে তো রে নিষ্ঠুর কালা
নাইক তার বিচ্ছেদজ্বালা।
আবার চক্ষু বুঁজে জপ মালা
লা-শরিকাল্লা সে কালা॥

তখন আকরম খাঁ কেন রুষ্ট হয়ে লালনকে ছুষবেন? তাঁর প্রান্তীয় বোধবুদ্ধি তাঁকে ঔদার্য দেয় নি, ফলে শুধু লালন নয়, যে-কবির রচনাতেই হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়বোধের ইঙ্গিত আছে সেখানেই তিনি রক্তচক্ষু। একা আকরম নন, মোহম্মদ আবু তাহের বর্ধমানী নামে একজন কট্টরপন্থী তাঁর "সাধু সাবধান" বইতে লালনকে 'ইসলামবিরোধী, শরীয়তবিরোধী, বেশারাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ফকির' বলে চিহ্নিত করে ক্ষিপ্ত বাক্যে বলেছেন :[৭]

লালন আল্লাহকে ও আল্লার সৃষ্ট মানুষকে একাকার করে দিয়েছে। লালনের গানে আছে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ; লালনের গানে আছে নর-নারীর অবাধ মিলনের প্রেরণা, লালনের গানে আছে গুপ্ত যৌনপ্রক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার গভীর উৎসাহ; লালনের গানে আছে নাপাক দ্রব্য ভক্ষণ করার প্রেরণা; লালনের গানে আছে তৌহিদবিরোধী কালাম। লালনের গানে আছে শরীয়তবিরোধী কথা। লালন আজ নাই, কিন্তু লালনের হাজার হাজার রূহানী সন্তান বিরাজ করছে। তার ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার জালে ফেলে হাজার হাজার মানুষকে সে বিভ্রান্ত করে গেছে।

মৃত্যুর পরেও লালন সম্পর্কে এত রোষ, লালনপন্থীদের সম্পর্কে এত বিদ্বেষ একদিকে যেমন প্রমাণ করে মারফতপন্থার বিপুল বিস্তার, তেমনই বোঝা যায় কার্যকালে লালনধারার তত্ত্বব্যাখ্যাতা বা উচ্চবর্গীয় সমর্থকের অভাব। বাঙলার লোকধর্মের এ এক দুর্ভাগ্যের দিক যে তাঁদের প্রাতিস্পর্ধীদের সঙ্গে তাত্ত্বিক সংগ্রাম বা ভাষ্যরচনার মতো শিক্ষিত মানুষ বিশেষ ছিলেন না। তাই লালনপন্থা যে কেবল বিরুদ্ধতায়, আক্রোশে ও অপপ্রচারে কালিমালিপ্ত হয়েছে তাই নয়, সাহেবধনী ও বলরামী সম্প্রদায়ের একই পরিণতি হয়েছে। এসব লৌকিক ধর্ম আজ নষ্ট ভ্রষ্ট বিলীয়মান। অথচ টিকে গেছে সহজিয়া বৈষ্ণব ধারা আর কর্তাভজা শাখা। তার কারণ এই দুই সম্প্রদায়ে শিক্ষিত ও তাত্ত্বিক লোক অনেকে ছিলেন এবং আছেন। সহজিয়া তত্ত্বের অজস্র পুঁথি ও ভাষ্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নৈষ্ঠিক ধারার প্রায় সমান্তরাল এক বিপুল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধি ও সমর্থন সহজিয়াদের আছে। কর্তাভজাদেরও সংস্রব ও সংযোগ ছিল উচ্চবর্ণের আর উচ্চবর্গের সঙ্গে। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল এবং বহু ব্রাহ্মণ কর্তাভজাদের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক ছিলেন। কর্তাভজাদের তাত্ত্বিক গুরু এবং সংগঠক দুলালচাঁদের (১৭৭৬-১৮৩৩) ঘনিষ্ঠ পার্ষদ ছিলেন কাশীনাথ বসু, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, রামানন্দ মজুমদার ও নীলকণ্ঠ মজুমদার। দুলালচাঁদ মুখে-মুখে যে-ভাবের গীত রচনা করতেন তার অনুলেখক ছিলেন রামচরণ চট্টোপাধ্যায়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ঘোষ-পাড়ার সতীমা-র খ্যাতিসম্পন্ন সাধনপীঠে নিম্নবর্গের পাশাপাশি উচ্চবর্গেরও যোগদান সমাদৃত। কলকাতাতে আজও বহু ব্যবসায়ী ও ধনী মধ্যবর্গ কর্তাভজা মতে ভজন সাধন করেন। এককালে ডাফ, মার্শম্যান প্রভৃতিবিদেশীপাদ্রীঘোষপাড়ার কর্তাভজা-পন্থীদের সম্পর্কে সকৌতূহল উৎসাহী ছিলেন। উনিশ শতকের ব্রাহ্মসেবক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তাভজাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। মূলত এইসব উচ্চবর্গের সংস্রব ও মেধাবী সংযোগে কর্তাভজাপন্থীদের সামান্য লোকধর্ম বহুল প্রচার পায়। যার একটা বড়ো প্রমাণ, ১৮৯৩ সালে শিকাগোর প্রসিদ্ধ ধর্মসম্মেলনে কর্তাভজাদের ধর্মনেতা দুলালচাঁদ অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। দুলালচাঁদ অবশ্য তার আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন। মোটকথা, একটি গৌণলোকধর্ম যে এতটা গুরুত্ব ও প্রসিদ্ধি পেয়েছিল তার মূলে শিক্ষিত মানুষের উৎসাহ। উনিশ শতকের শেষে কর্তাভজা ধর্ম এতটাই প্রসারিত হয় যে হিন্দু-ধর্মের অনেক নৈষ্ঠিক ব্যক্তি আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃত পড়লে দেখা যায় তিনি কর্তাভজাদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করেছেন। দাশরথি রায় কর্তাভজাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-মুখর পাঁচালি লেখেন। জেলেপাড়া থেকে কর্তা-

ভজাদের বিদ্রূপ করে সং বেরোয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো সাধকও কর্তাভজাদের সাধনপ্রণালী সম্পর্কে কৌতূহলী হন। জগদ্বন্ধু মৈত্র লিখেছেন :[৮]

> তিনি ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলান্তরে দেশে-বিদেশে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কর্ত্তাভজা, অঘোরপন্থী, কাপালিক, বাউল, রামাৎ, বৌদ্ধ-যোগী প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে এই সময়ে তিনি গমন করেছিলেন। কিন্তু কোন সম্প্রদায়েই তিনি তাঁহার প্রাণের বস্তু পান নাই। কর্ত্তাভজাদিগের ধর্ম্মমত তাঁহার নিকট নাস্তিকতা বলিয়া মনে হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

এ প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের নিজের জবানি :

> কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধুর সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম ও তাঁহাদিগের নিকট বিস্তর ধর্ম্মকথা ও অনেক উপদেশ পাইলাম। কিন্তু তাহাতে আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারিল না; আমার অন্তরের বন্ধু সেখানে পাইলাম না।

লালনপ্রসঙ্গে কর্তাভজাদের কথা উঠল প্রধানত এই জন্য যে, লালনবিদ্বেষী তথা বাউলফকির-বিরোধীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লালনের মতের সঙ্গে কর্তাভজাদের একই সঙ্গে নিন্দা করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছে লালনপন্থা ও কর্তাভজা মতবাদ দুটিই চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা এবং দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। দুই দলই কদাচারী ও ঘৃণাযোগ্য। দুই দলই প্রবীণ মত থেকে সরে একধরনের সামাজিক স্থিতির পক্ষে বিঘ্নকর সাধনভজনের অনুসারী, যা বিপজ্জনক।

লালন প্রসঙ্গে কর্তাভজাদের কথা উত্থাপিত হতে পারে আরেক কারণে। লোকধর্ম যথাযথ সংগঠিত হলে এবং শিক্ষিত মানুষ তাতে যোগ দিলে কতদূর লোকপ্রিয়তা ও বিস্তার পায়, আয়ুলাভ করে কত দীর্ঘকাল, তার সফল নমুনা কর্তাভজা গোষ্ঠী; আর এর ঠিক বিপরীত নমুনা মেলে লালনশাহী মতবাদে। লালনের তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে লালনপন্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের বিরোধ ঘটে। ছেঁউড়িয়া আশ্রম জীর্ণ হয়ে পড়ে। কুষ্টিয়া-যশোহর-পাবনা সর্বত্র শরিয়তবাদীরা বিশ শতকে লালনপন্থীদের সম্পর্কে মারমুখী হয়ে ওঠে। এ সবের কারণ লালনের নিঃসঙ্গ ভাবুকতা ও সাধকোচিত নির্লিপ্তি। উত্তরপুরুষদের জন্য তিনি শুধু রেখে গেলেন অসামান্য গানের সঞ্চয়। কিন্তু লালনতত্ত্ব দর্শন প্রচারের জন্য কেউ থাকল না। ছেঁউড়িয়া আশ্রমের লালনশিষ্যরা যোগ্যতার সঙ্গে গুরুর ভাব-ধারার পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। লালনের নির্বিকার স্বভাব এবং প্রচারমনস্কতার অভাবও এ-সম্প্রদায়কে সংবৃত করে দিয়েছে। রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন খুব সঙ্গত যুক্তিতে :[৯]

> তান্ত্রিকদের মধ্যে অভিনবগুপ্তের মতো ভারত-বিখ্যাত আচার্য ছিলেন; বহু বড় বড় শৈবাচার্য ছিলেন; সহজিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে সরহের মতো অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি এবং সিদ্ধ ছিলেন; বৈষ্ণবদের মধ্যে রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, সনাতন গোস্বামী, রূপ এবং জীব গোস্বামী ছিলেন। গরিব-অবহেলিত, সহজিয়া বৈষ্ণবদের আর বাউল-ফকিরদের এ রকমের কোন উচ্চস্তরের ভাষ্যকার ছিলেন না; থাকলে সহজিয়া-তত্ত্ব, ফকির-বাউল-তত্ত্ব "জাতে" উঠত। জাতবিচারকে লালন ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তাই সম্ভবত তাঁর দলে কোন "পণ্ডিত" অথবা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ যোগ দেন নি। বামুনরা দলে ঢুকলে, লালনতত্ত্ব নিয়ে মস্তবড় ধর্মতত্ত্ব তৈরি হত।

লালন সম্পর্কে তিনি আলাদা করে বলেছেন :

> তিনি যে একজন প্রতিভাশালী কবি, এবং উচ্চ-স্তরের সাধক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, যেহেতু সামাজিক বিচারে তাঁর কোন "জাত" ছিল না তাই তিনি রামপ্রসাদ সেন, অথবা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের মতো সম্মান এবং স্বীকৃতি পান নি। অথচ যে প্রতিভা তাঁর গীতাবলীতে দেখা যায়, তা যদি তিনি নিজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতেন, কিংবা নিজের ঢাক পেটাতেন, তবে তিনি অমন অখ্যাত এবং অবজ্ঞাত হয়ে থাকতেন না।

অখ্যাত এবং অবজ্ঞাত থাকা, নিজের একটা আড়াল তৈরিতেই বরং লালনের প্রয়াস ছিল বেশি। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আজ তিনি উন্মুক্ত, প্রচারিত, প্রসিদ্ধ। তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা এখন এতটা যে তাঁর গানে বিকৃতি আর শব্দসংস্কার চলছে। যে গান তাঁর লেখা নয় তা-ও লালনগীতি বলে চালানো হচ্ছে। লুৎফর রহমানের সংকলন থেকে এমন এক গানের নমুনা :

কেমন ন্যায়বিচারক খোদা বল গো আমায়।
তাহা হলে ধনী-গরীব কেন এ ভুবনে রয়॥
ভাল-মন্দ সমান হলে
আমরা কেন পড়ি তলে
কেউ দালানকোঠার কোলে
শুয়ে আরাম পায়॥
সেই আমরা মরণের পরে
যাব নাকি স্বর্গপুরে
কে মানিবে এসব হেরে
এই দুনিয়ায়॥

এমন একখানি গান লালন লিখেছেন ভেবে কেউ-কেউ আত্মপ্রসাদ পেতে পারেন কিন্তু ভণিতাবর্জিত এত দুর্বল চেষ্টাকৃত বাণী লালনের দৃপ্ত গানের সঙ্গে মিল খায় কি? ইতিপূর্বে উদ্ধৃত লালনের নামে প্রচারিত এক গানে আশরাফ-আতরাফদের শ্রেণীপার্থক্য নিয়ে চিন্তা আমরা পেয়েছি, এবারে পেলাম ধনবৈষম্যের চেতনাবহুল গান। ধনী-গরিবের দালান আর মাটির আলাদা জীবন। এসব গান লিখে যাঁরা লালনের নামে চালাচ্ছেন তাঁদের মতলব প্রতিবাদযোগ্য। লালনের এটিও এক দুর্ভাগ্য যে তাঁর জীবন ও গান অপ্রচার থেকে অপপ্রচারে বিপন্ন। সত্যিকারের লালনপ্রেমী তাঁকে বলা যাবে যিনি সত্যদৃষ্টি নিয়ে ভাবালুতাবর্জিত বিচারপ্রবণতার সাহায্যে লালনের জীবন ও গানকে উদ্‌ঘাটিত করবেন। তাঁকে বুঝতে হবে লালন ফকির একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। স্ব-বিরোধের যথেষ্ট উপাদান তাঁর জীবনতথ্য আর গানের স্বভাবে তিনি নিজেই বুনে রেখে গেছেন। লালন ছিলেন সমকালীনদের চোখে শ্রদ্ধেয়, মৃত্যুপরবর্তী কালে নিন্দিত, মরণোত্তর কালে উচ্চসমাজে স্রষ্টারূপে নন্দিত, ধর্মব্যবসায়ীদের বিকৃত ইচ্ছার পণ্য, গবেষক-দের যথেচ্ছ মূল্যনির্ধারণের উপাদান এবং ব্যর্থ গীতিকারদের ভণিতারূপে অপব্যবহৃত। অথচ দুই বাঙলার কত আখড়া আর মেলায়, কতরকম শব্দ-গানের আসরে, কত মরমি লৌকিক সাধকের অন্তর্মনে প্রতিদিন বেঁচে আছেন তিনি। যে-কোনো বাউল-ফকিরের গানের উতোর-চাপানের আয়োজনে লালনের গানই শেষ গান, তাঁর গানের তত্ত্বই সবচেয়ে অকাট্য তত্ত্ব। এই দুর্লভ উচ্চাসন তাঁর নিজের অর্জন। প্রয়াণের পর সুদীর্ঘকাল অবজ্ঞাত থাকার পর রাবীন্দ্রিক প্রয়াসে তাঁর যখন পুনরুজ্জীবন হল, তখন দেখা গেল যোগ্যের কণ্ঠেই পড়েছে জয়মাল্য। দুই বাঙলার পল্লীবাসীর সঙ্গে নগরবাসীও তাঁকে বাউল-পরম্পরার শীর্ষে স্থান দিয়েছেন। লালন তার ফলে পেয়েছেন এক দ্বিরায়তনিক মাত্রা।

[ক্রমশ

উল্লেখপঞ্জী

১. মুসলমানের জাতিভেদ। মোহাম্মদ ইয়াকুব আলি। সেওড়াফুলি, হুগলী। ১৩৩৪। পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।

২. জাতিভেদপ্রথা এবং বাংলাদেশের বাউল সমাজ। কুষ্টিয়া, ১৯৮৮। দ্রষ্টব্য, ভূমিকা এবং পৃষ্ঠা ১-৫।

৩. লালন-গীতিচয়ন, ১ম খণ্ড: এস. এস. লুৎফর রহমান। ঢাকা ১৯৮৫।

৪. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস। ঢাকা, ১৯৬৫। পৃষ্ঠা ১১৮-১৯।

৫. বাউল ধ্বংস ফৎওয়া। পৃষ্ঠা ১৫৫-৫৬।

৬. এ জাতীয় বহুতর গানের জন্য দ্রষ্টব্য : বাংলা দেহ-তত্ত্বের গান : সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। ১৯৯০।

৭. আবুল আহমান চৌধুরীর "লালন শাহ" বইতে উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা ১২৭।

৮. প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী : শৈলেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬০। পৃষ্ঠা ১৭৪-৭৬।

৯. "লালনতত্ত্ব"। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা। ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। পৃষ্ঠা ২৩৬, ২৪২।

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ভ ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্ত মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

গুরু

গুণময় মান্না

খাস কলকাতা থেকে মাইল দশেক দূরে সোনাপুর গ্রাম। সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন, সেও প্রায় মাইল তিনেক হবে। এ গ্রামে এখনো বাস চলে না, রাস্তা-ঘাট কাঁচা, কেবল তিন চাকার রিকশ যাতায়াত করে, আর ছেলেমেয়েরা সাইকেল চড়ে থাকে। ফলে মহানগরীর এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও সোনাপুর গ্রামই থেকে গেছে।

সম্প্রতি সোনাপুর-এসপ্লানেড একটা মিনিরুট খুলবার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু এ গ্রামের এক অতিশয় মান্য বর্ষীয়ান ব্যক্তি দেববর্মার অসম্মতিতে তা খোলা হয় নি। গ্রামের মেয়ে-পুরুষে এ নিয়ে তাঁর কাছে আর্জি করতে এসেছিল। তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'শহুরে হওয়ার অনেক হ্যাপা, কী দরকার খাল কেটে কুমির আনার…'। বোঝা যায় লোকগুলি সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু মুখ নীচু করে থাকে। প্রতিবাদ জানানোর সাহস নেই। একটি কমবয়সী বউ তবু বলল, 'দাদু, মিনি হলে আপনার কলকাতা যাওয়ার কত সুবিধে হত, এই এখানে চড়লেন, আর…'। বৃদ্ধ খুব দুষ্ট, উত্তরে বললেন, 'কেন গো, নাতবউ, বেশ তো দুপুর-বেলা সখীদের সঙ্গে তিন মাইল হেঁটে ট্রেন ধর, ম্যাটিনি দেখবে বলে, আটকাচ্ছে কোথায়…' দেববর্মা এমন-ভাবে বললেন, সবাই হেসে ফেলল। ব্যস, ব্যাপারটার ওখানেই ইতি।

এত সহজেই ব্যাপার মিটে যায়, এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু ঘটনা সত্যি। দেববর্মা যাকে বলে গুরুর গুরু, রাজার রাজা, পরম জ্ঞানী। তাঁর কত শিষ্য-প্রশিষ্য আছে, তারা কলকাতা-বোম্বে-দিল্লিতে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে পড়ে বেশ করে-কম্মে খাচ্ছে। একজন বয়স্ত তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'কী হে, বর্মা, তোমার চেলারা এত হোমরা-চোমরা, আর তুমি এই কুঁড়েঘরে সারা জীবন কাটিয়ে দিলে…'

সত্যি কথা বলতে কী, তাঁর শিষ্যেরা কে কোথায় কী করেছ, কী হয়েছে, দেববর্মা এসব খোঁজখবর করতেন না। হেসে বললেন, 'তাতেই তো গুরুর গৌরব। আর

অবস্থার উলটো, মানে বিপরীতের কথা বলছ? ডায়লেকটিকস তো আমিই শিখিয়েছিলাম হে! জান তো, সব কালের সব দেশে গুরুদের স্বেচ্ছাবৃত অকিঞ্চনতা। বিপরীত আছেই, যেমন শহরের উলটা গ্রাম, ধরো এই সোনাপুর—'

'ওই নিয়েই থাকো, আর এদিকে যে…', না, বয়স্ত হলে কী হবে, বাক্যটা শেষ করবার সাহস নেই। দেরবর্মা এমনি শান্ত সৌম্য বটে, কিন্তু রেগে গেলে সে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড হয়।

সেদিন শীতের সকাল। মুখহাত ধুয়ে দেববর্মা বাইরের ঘরে এসে চৌকির ওপর বসলেন। এই ঘরেই তিনি অভ্যাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দুপুর পর্যন্ত এইরকম চলতে থাকে, তারপর স্নানাহার সেরে এই ঘরেই তিনি বিশ্রাম করেন, পড়াশুনোও; তখন তাঁর দরজা বন্ধ। অভ্যাগত লোকজন সকলেই তাঁর অনুগামী, শিষ্যও বলা যায়; তা ছাড়া আসে গুণমুগ্ধ ভক্তরাও। তাদেরই একজন দেববর্মার কুটিরের নাম দিয়েছিল, তপোবন। —'দেবদা, আগেকার কালে রাজা-রাজড়ারা আসত মুনি-ঋষিদের কাছে উপদেশ নিতে, আমরাও আসি। আপনাকে ছেড়ে আমরা চলতেই পারব না।'

সিদ্ধার্থ নামে দেববর্মার এক সহযোগী ছিল। সে লোকটির তিনকুলে কেউ নেই, দেববর্মার বাড়িতেই সে থাকে, যেমন ঘর-গেরস্থালির সাহায্য করে তেমনি দর্শনার্থীর ভিড় ঠেকায়। এই লোকটি বিচিত্র প্রকৃতির। পড়াশুনো করেছে, তত্ত্বাদিও বোঝে ঠিকই; কিন্তু সে মনে করে দেববর্মার কথা সে যেমন বোঝে তেমন কেউ নয়। এবং যদিও দেববর্মা সম্বন্ধে তার একশোভাগই শ্রদ্ধা ও আত্মগত্য, তবু সে খোদার ওপর খোদকারিও করে থাকে। সেটা দর্শনার্থীরা বোঝে, কিছু বলে না, কারণ তার ছাড়পত্র না হলে দেববর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার অসম্ভব। দেববর্মাও সেটা বোঝেন আর মনে-মনে হাসেন। মাঝে-মাঝে রাগ হয় না তা নয়, ভাবেন সিধুকে বিদায় করবেন, কিন্তু কিনা, দেববর্মার বয়স হয়েছে, নিজে সব কিছু পারেন না, আর তাঁর প্রিয় সিধুর ওপর একরকম স্নেহবশ্যতাও এসে গেছে।

দেববর্মার বাইরের এই ঘরটিতে আসবাবপত্র তেমন নেই। পুব দেয়ালের জানলার পাশেই একটি চৌকি পাতা, তার এক পাশে একটি তাকিয়া, অন্যপাশে দু-একখানা বই, লেখার জন্য কাগজ-কলম। চৌকির সামনে মেঝের ওপর শতরনজি আর তার ওপর চাদর পাতা, লোকজন দক্ষিণ দেয়ালের দরজা দিয়ে ঢুকে মেঝেতেই বসে। ফলে যখন দেববর্মা চৌকিতে বসে কথা বলেন, আর দর্শনার্থীরা মেঝেতে বসে ঊর্ধ্বমুখে উৎকর্ণ হয়, তখন দৃশ্যটা সেই তপোবনের স্বামী-শিষ্য-সংবাদের মতোই হয়ে যায় বটে।

যাই হোক, দেববর্মা চৌকির ওপর রোদ পিঠ করে বসলেন। পোশাকপত্র খুব সাদাসিধে, ধুতি আর গেনজি, শীতের জন্য তার ওপর কেবল একটা মোটা সুতির চাদর জড়ানো, তিনি উলের জামা কখনো ব্যবহার করেন না। তাঁর চেহারা এখনো বেশ ভরন্ত, পাকা চুলদাড়ি, ভরাট মুখে সেটা বেশ গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি করেছে।

রোদ পিঠ করে বসতে মনে হল দেববর্মার বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। সেই সময় তাঁর বছর দশকের নাতনি মিনু বেশ বড়ো মাপের ঢোলক-কাপ-ভর্তি চা দিয়ে গেল, আর মোরাদাবাদি ছোটো রেকাবিতে একটি চুরুট। বলল, 'দাদু, ঠাকুমা বলল, তোমাকে আর চুরুট দেবে না, চাইলে চা দেবে…'

এই মেয়েটিকে জন্ম দিয়ে দেববর্মার পুত্রবধূ মারা যায়, তার কিছুকাল পরে পুত্রও। তাঁর আর কোনো পুত্রকন্যা নেই, ফলে এই নাতনিটিকে তিনি খুব ভালোবাসেন। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর-মাখা স্বরে বললেন, 'পাগলি…', তাতে তার উত্তর কী হল কে জানে, কিন্তু মেয়েটি দাদুর আদর খেয়ে একটু পরে চলে গেল।

দেববর্মার তারিয়ে-তারিয়ে চা পান শেষ হল, তারপর চুরুটটি ধরিয়ে—সত্যি কথা বলতে কী, তাঁর বিলাস-ব্যসন বলতে এই একটি—টান দিতে আরম্ভ করেছেন, এমন সময় সিধু ঘরে এসে ঢুকল। তার একটা জরুরি আগমন-বার্তা ঘোষণার ছিল, কিন্তু দেখল যে দেববর্মার ভুরু কোঁচকানো, তাঁর চোখ দেয়ালের ওপর—কি, না একটা টিকটিকি কিছু দূরে থেকে এক বড়োসড়ো পোকার দিকে তাক করে আছে, যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সিধু ভাবল গুরু বোধ হয় এই শিকার ধরাটা পছন্দ করছেন না, হাততালি দিয়ে টিকটিকিটাকে তাড়াতে গেল, কিন্তু গুরু হাত বাড়িয়ে নিষেধ করলেন।

'ধরতে দাও, টিকটিকি তো আর মানুষ নয়…'

'আজ্ঞে…' সিধুর মুখখানা কাঁচুমাচু হয়ে উঠল।

'বুঝলে না, টিকটিকি একটা ধরেই খুশি, মানুষ খুশি হয় কি? তারপর, তোমার কী বার্তা?'

'বার্তা খুব গুরুতর, দেবদা। সুরেন্দ্র আহত হয়ে এসেছে, তার কপালে রক্ত…'

'অ্যাঁ, বল কী! সুরো আহত! তাকে যে আমি বুকে করে মানুষ করেছি, কই সে…'

'বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'বাইরে অপেক্ষা করছে? তুমি এত বেকুব কেন, আনো তাকে…'

আনতে হল না, আহত সুরেন্দ্র মাতালের মতো টলতে-টলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, নিজের দেহটাকে কোনো রকমে টেনে দেববর্মার সামনে পর্যন্ত এল, বোধহয় পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার জন্য হাত বাড়াল, কিন্তু পারল না, ধড়মড় করে পড়ে গেল মেঝের ওপর, যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, 'দেবদা…'

'তোর এ কী অবস্থা হয়েছে, সুরো? কী করে হল…'

সুরেন্দ্রর অবস্থা সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছিল বটে। তার বয়স সাতাশ-আটাশ হবে, টকটকে ফরসা রঙ কিন্তু এখন বিবর্ণ, দেহ লম্বা সুঠাম কিন্তু এখন প্রাণ-শুষে-নেওয়া যেন প্যাকাটি। সুরেন্দ্র খুব ভালো ছাত্র ছিল, এম-এ পর্যন্ত কখনো দ্বিতীয় হয় নি, লনডন থেকেও একটা ডিগ্রি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত রুজি-রোজগারের ধান্দায় না গিয়ে সে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের সাচ্চা কর্মী হয়ে উঠেছিল। কী করে বঞ্চিত শ্রমজীবীর উন্নতি করা যায়, তারা স্বপ্রতিষ্ঠ হয়, সে নিয়ে দেববর্মার কাছেই সে তরুণ বয়স থেকেই তালিম নিয়ে এসেছিল; এখন সেই ট্রেড-ইউনিয়ন করতে গিয়েই তার এই হাল হয়েছে। বিরোধী পক্ষের ডানডায় কপাল ফাটিয়ে ফিরে এসেছে।

'দেবদা, আমি মরে গেছি…'

দেববর্মা চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে এসেছিলেন, ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'সুরো, তোর কী হয়েছে, বল ভাই, তোকে এই অবস্থায় আমি আর দেখতে পারছি না। কী করে এমন অবস্থা হল…'

'কী করে এমন অবস্থা হল? কেন, আজকের কাগজ পড়েন নি?…'

'না, পড়া হয় নি, দেয় নি আমাকে এখনো…'

'এই দেখুন…' সুরেন্দ্রের বাঁ হাতে সেদিনকার একখানা খবরের কাগজ ছিল, সেটা কষ্ট করে ডান হাতে নিয়ে এল, তারপর দেববর্মার দিকে তুলে ধরল। বলল, 'সাত পাতায় দেখুন, তিনের কলমে…'

দেববর্মা খুব আগ্রহের সঙ্গে সংবাদটা পড়তে শুরু করলেন: অ্যানড্রু ফ্রেজার চটকলে হাঙ্গামা—তরুণ শ্রমিকনেতা নিখোঁজ। চটকলটিতে কিছু দিন থেকে দফায়-দফায় শ্রমিক-ছাঁটাই চলছিল; শ্রমিকেরা তার প্রতিবাদ জানাতে থাকলে কোম্পানি লক-আউট ঘোষণা করে। অতঃপর মিলগেটে বহুসংখ্যক শ্রমিক কারখানা খোলার দাবিতে ধ্বনি দিতে থাকলে কোম্পানির ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা তাদের ওপর চড়াও হয়, এবং উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধে। ইট-পাটকেল ছুরি-লাঠি ব্যবহৃত হতে থাকলেও পুলিশ হস্তক্ষেপ করে নি, যদিও মাত্র একশো গজের মধ্যে পুলিশ-পিকেট বসানো হয়েছিল। একনিষ্ঠ শ্রমিক-কর্মী ও তরুণ নেতা সুরেন্দ্র মজুমদার লাঠির আঘাতে সাংঘাতিকভাবে জখম হন, শ্রমিকেরা তাঁকে

স্থানান্তরিত করতে গেলে আততায়ীরা তাঁকে কেড়ে নিয়ে চলে যায়। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। সংশ্লিষ্ট মহল নিখোঁজের ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বোধ করছেন।

দেববর্মা খবরের ওপর দ্রুত চোখ বুলোচ্ছেন, আর সুরেন্দ্র একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ভাব বুঝবার জন্য। সে বলে উঠল, 'দেবদা, ওরা ভেবেছে, আমি মরে গেছি, আমার লাশ গায়েব করে দিয়েছে, কিন্তু ওদের হাত থেকে আমি আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি। আপনার কাছে আমি জানতে চাই…'

কিন্তু সুরেন্দ্রকে থমকে যেতে হল—দেববর্মার মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সে মুখে প্রথম দিকে ছিল উদ্বেগ এবং স্নেহ, কিন্তু তারপর তা কঠিন হয়ে উঠল, 'পালিয়ে এসেছ! আমার কাছে তুমি জানতে চাও, না? এতদিন ধরে আমি তাহলে তোমাদের কী শিখিয়েছি!…'

সুরেন্দ্র সভয়ে দেখল দেববর্মার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, হাতের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'সিধু, একে তুমি আমার কাছে কেন নিয়ে এসেছ? যাও…' বলে হাত বাড়িয়ে তিনি খোলা দরজা দেখিয়ে দিলেন।

সিধু তাড়াতাড়ি সুরেন্দ্রের কাছে এগিয়ে এল। সে তখনো মেঝের ওপর অর্ধোত্থিত অবস্থায় পড়েছিল, তার হাত ধরে তুলবার জন্য সিধু ঝুঁকে পড়ল এবং দেববর্মার অজান্তে তার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু চোখ টিপে দিল, যার অর্থ হল, 'ভয় পেও না'। তারপর তাকে দরজার বাইরে নিয়ে চলে গেল।

২

ঠিক টেনে-হিঁচড়ে বের করে দেবার দরকার ছিল না। দেববর্মা বেরিয়ে যেতে বলেছেন, সুতরাং সুরেন্দ্র মাথা নীচু করে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু ঘরের বাইরে এসে সিধু ওর বাহুতে আলতো করে ছুঁয়ে দিল। —'থামো, যাচ্ছ কোথায়?'

'যাচ্ছি কোথায়? জানি না…' নিভে-যাওয়া স্বরে বলল সুরেন্দ্র। —'দেবদাই যদি আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, তাহলে আমার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকল কোথায়? ওদের ডানডার বাড়িতে আমার মরে যাওয়াই উচিত ছিল…' বলে সকরুণ চোখে সিধুর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল, দেখল যে সিধু একটু আগের মতোই চোখ মটকে আছে—'আপনি কী বলছেন?…'

'বলছি এই, যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে। দেবদা তাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বউদি তো আছেন; চলো তাঁর কাছে, তুমি তাঁর কাছেই থাকবে। আমি জানি তিনি কখনো তোমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না…'

সুরেন্দ্র কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'বল কী সিধুদা, এটা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়ে গেল না?…'

'এ আর নতুন কথা কী, চিরকালই সেটা হয়ে এসেছে…'

'না-না, বউদি কী মনে করবেন…'

'দেখো সুরো ভাই, তোমার এখন কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা দরকার। তুমি বাইরে গেলেই আবার ওদের হাতে পড়বে, ওরা মরিয়া হয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাহলে তুমি আর বাঁচবে না। তাছাড়া, তুমি এখন দারুণ জখম হয়েছ, ঘা-টা সারিয়ে-শুকিয়ে তুলতে হবে তো। জান তো, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তুমি যে শ্রমিকদের ভালো করতে যাবে, আন্দোলন করবে, তা আগে তো নিজে বাঁচ, তারপর তাদের পাশে দাঁড়াবে…'

'হ্যাঁ, কিন্তু…'

'কিচ্ছু ভেবো না, বউদি তোমাকে নার্সিং করে ঠিক সারিয়ে তুলবেন। শোনো, তোমাকে নিয়ে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, দেবদা ওদিকে আবার ডাক দেবেন। বউদির কাছে থাকো, তিনি তোমাকে আততায়ীর কাছ থেকে ঠিক লুকিয়ে রাখবেন, দেবদার কাছ থেকেও। তিনি জানতেও পারবেন না…আর শোনো, তুমি একটু সেরে ওঠো। দু-চারদিন পরে তোমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে যথাকর্তব্য স্থির করা যাবে, আমি কথা বলব। তুমি এখন অন্তঃপুরে ঢোকো…'

'তুমি আসবে না?…'

'বললাম না, দেবদা ডাকবেন? ভেতরে চলে যাও, কোনো ভয় নেই…'

সিধুর কথাই ঠিক। দেববর্মার স্ত্রী অরুন্ধতীর যেমন রূপ তেমনি গুণ। বয়েস হয়েছে কিন্তু শরীরে কোনো গ্লানি নেই। টকটকে রঙ, পাকা মাথায় সিঁদুর পরে যখন মিষ্টি হেসে কথা বলেন, তখন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আসলে তিনি খুব স্নেহশীলা, সেটাই তাঁর একমাত্র—নইলে যেমন স্বামীর গভীর প্রজ্ঞা তিনি বোঝেন না, তেমনি তাঁর অগুনতি অনুচরদের হরেক রকম কার্য-কলাপের ধারও ধারেন না। কিন্তু সকলের অভাব মেটানো, আর দুঃখকষ্টে সান্ত্বনা দেওয়াই তাঁর কাজ। সুতরাং সুরেন্দ্রকে আহত রক্তাক্ত অবস্থায় অন্তঃপুরে ঢুকতে দেখেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে পড়লেন। কপাল পরিষ্কার করে ব্যানডেজ বেঁধে দিলেন, কিছু খাইয়ে তারপর তাকে শুইয়ে দিলেন নিজের ঘরে। মশারি ফেলে দিয়ে বললেন, 'বাছা, এমন করে মারামারি করতে আছে! এখন তুমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো, দুপুরবেলা আমিই তোমাকে ওঠাব, ঝোলভাত খাইয়ে যাবখন…'

দিন কয়েকের মধ্যেই সুরেন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু সেটা কেবল দেহের দিক থেকে। মনে যেমন উদ্বেগ, তেমনি অশান্তি। উদ্বেগ এইজন্য যে, শত্রুপক্ষ তাকে খুঁজে বের করে ফেলবে তার জন্য ততটা নয়, দেববর্মার অজানিতেই তাঁর ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছেন, সেটাতেই তার ভয়। ভাগ্যিস এসব ব্যাপারে তিনি এতই আত্মভোলা যে তাঁর অন্তঃপুরে কোথায় কে লুকিয়ে আছে, তা জানা তাঁর পক্ষে একরকম অসম্ভব। তা ছাড়া ভেতরে তিনি আসেনই বা আর কতটুকু, স্নান-খাওয়ার জন্য বই তো নয়। রাত্রেও তিনি প্রায়ই ভেতরে আসেন না, বাইরের ঘরেই শুয়ে পড়েন।

তা হল, কিন্তু সুরেন্দ্রের ভাবনা, 'আমি শেষকালে গুরুর কাছেই, তাঁরই গৃহে মিথ্যাচার করতে যাচ্ছি। ছিঃ…'

তার এমনও মনে হয়, তখনই গিয়ে গুরুর কাছে দোষ স্বীকার করে, কিন্তু সিধু আবার তাকে আটকায়। বলে, 'অমন কাজটি কোরো না। দেবদাকে তুমি সন্তুষ্ট করতে তো পারবেই না, উপরন্তু তোমার আখের ঝরঝরে হয়ে যাবে…'

সুরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলে, 'তবে থাক, দরকার নেই। সুযোগ হলেই আমি এখান থেকে চলে যাব…'

আখের—ওইটাই হচ্ছে সুরেন্দ্রের অশান্তি। দুপুরে যখন দেববর্মা স্নানাহার সেরে বাইরের ঘরে চলে যান, তাঁর স্ত্রী ঘরকন্না সেরে একটা গল্পের বই নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়েন, অন্তঃপুর স্তব্ধ হয়ে আসে, তখন এই চিন্তাটাই তাকে কুরেকুরে খায়।

সিধুরও এই সময় কোনো কাজ থাকে না। তখন হয় সে নিজস্ব প্রয়োজনে বেরিয়ে যায়, নয়তো সুরেন্দ্রর কাছে আসে। নানা রকম কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।—'সুরো ভাই, তুমি সব সময় অমন মনমরা হয়ে থাক কেন। তোমাকে উৎসাহী হতে হবে, কাজ করতে হবে, কাজ করে একদিন তুমি দেবদার কাছে ফিরে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে…এখন তোমাকে সব কিছু নতুন করে গড়ে নিতে হবে…'

'সিধুদা, আমার মনের অবস্থা তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না। সব কিছু গড়ে নিতে হবে…সেটা আর হল কই? গড়ে নিতেই তো গিয়েছিলাম, কিন্তু কী হল? তাছাড়া, প্রত্যেকের তো একটা দাঁড়াবার জায়গা থাকা চাই, দেবদাই আমার পাদপীঠ ছিলেন, তিনিই আমার হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন · সেই পায়ের তলার মাটি সরে গেলে মানুষের কী অবস্থা হয় অনুভব

করতে পার? আচ্ছা, সিধুদা, তুমি তো সব সময়ই দেবদার কাছে থাক, আমার সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন? সত্যি বলো…'

'কই, না, কিছু বলতে শুনিনি। তোমাকে দোষ দেওয়া তো দূরের কথা, আমি তাঁর মন জানি, তিনি তোমাকে কত ভালোবাসেন…'

'তাহলে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন? কী দোষ হয়েছিল আমার…'

'শোনো, সুরো ভাই, সত্যি বলছি। দেবদার মন জানি বললাম তো, কিন্তু সে খুব কঠিন। এই দেখো না, সেই যেদিন সকালে তুমি মালিকের ডানডায় মাথা ভেঙে তাঁর কাছে হুড়মুড় করে এসে পড়লে, সেই সকালে তাঁর ঘরে ঢুকে কী দেখলাম জান…দেয়ালে এক টিকটিকি শিকার ধরার জন্যে তাক করে আছে। তাড়াতে গেলাম, দেবদা বারণ করলেন। তাতে কী বোঝায়? আমি নিশ্চিত জানি, তিনি জিঘাংসা একটুও পছন্দ করেন না…তাহলে? এর নিশ্চয়ই কোনো মানে আছে…'

হঠাৎ কী হল, সুরেন্দ্র আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল, তার নিষ্প্রভ চোখ ঝিলকিয়ে উঠেছে—'মানে আছে, ডায়লেকটিকস…'

'হবে হয়তো, তত্ত্বের অত সূক্ষ্ম প্রয়োগ আমি বুঝি না, যদিও দেবদাকে কিছুটা বুঝি বলে দাবি রাখি। আমার কী মনে হয় জান, ওই যে সেদিন তুমি বলেছিলে, মার খেয়ে তুমি পালিয়ে এসেছিলে, মার-টাকে নিষ্ক্রিয় করতে পার নি…সেই পালিয়ে আসাটা তিনি পছন্দ করেন নি। কিন্তু সে অবস্থায় তুমি যে আর কী করতে পারতে, তা আমি জানি না…'

'আমিও তখন জানতাম না, কিন্তু এখন জানি…'

মনে হল সিধুই এখন বিমূঢ় হয়ে উঠেছে, 'কী জান, আমাকে একটু বলো দিকি…'

'এই জেনেছি, টিকটিকিটাকে খেতে দিতে হবে, আর তাকে খেতে দিয়ে আমাকেও খেতে হবে। কারণ, না খেলে কেউ বাঁচে না, অন্যকেও বাঁচাতে পারে না। হ্যাঁ, ঠিকই তো '

সুরেন্দ্র তার গায়ের চাদর খুলে ফেলে দিল, বিছানা থেকে নেমে এল মেঝেতে। তার চেহারা এমনিতে পাতলা, তার ওপর এই কদিনের রোগভোগ আর মনস্তাপে তাকে কাহিল করে তুলেছিল, কিন্তু এখন মনে হল তার দেহে আসুরিক বলের আবির্ভাব ঘটেছে: —'আমি যাচ্ছি, যদি কখনো কাজ করে দেখাতে পারি, তাহলেই আবার দেবদার কাছে ফিরে আসব, তা না হলে এ মুখ আর দেখাব না।'

৩

জগতে সবকিছুই পরিবর্তনশীল, দেখতে-দেখতে তিনটি পাঁচ বছর কেটে গেছে। সোনাপুর গ্রামেরও দারুণ সব পরিবর্তন হয়েছে। তার সেই ছিমছাম পাড়াগাঁ-পাড়াগাঁ ভাব আর নেই। দেববর্মা এক কালে এখানে মিনিরুট খুলতে দেন নি, এখন গ্রামটা সাতটা বাসরুট আর ততোধিক মিনিরুটের মধ্যে পড়ে গেছে।

এদিকে দেববর্মারও যাকে বলে ভগ্নদশা। তাঁর এতদিনকার অনুচর সিধুর মৃত্যু হয়েছে, মারা গেছেন গৃহিণীও। তাঁর বাপ-মা-হারা প্রিয় নাতনিটির বিয়ে হয়ে গেছে, সেটা গৃহিণী জীবিত থাকার সময়েই। সে এখন স্বামীর সঙ্গে আসানসোলে থাকে।

কিন্তু একটা জিনিস আগেকার মতো এখনও থেকে গেছে, সেটা হচ্ছে তাঁর সকালের বৈঠক। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সকালবেলায় যেমন সূর্য উঠবেই, তেমনি দেববর্মার কাছে শ্রবণার্থীর সমাবেশ হবেই। কলকাতার সব অঞ্চল, এমনকী বিপরীত দূর-দূর প্রান্তের থেকে যেমন সব আসে, তেমনি মফসসলের রানাঘাট চন্দননগর কি বাগনান থেকেও ছেলেরা ফার্স্ট ট্রেন ধরে তাঁর কাছে এসে যায়। বড়োরা নয়, এই পনেরো-ষোলো থেকে শুরু করে বাইশ-চব্বিশ বছরের সব, গেঁয়ো কথায় যাদের সম্বন্ধে বলে, গলা থেকে এখনো যাদের মায়ের দুধের গন্ধ যায় নি।

সেদিন সকালে কিন্তু একটু অন্য রকম হল। একজন বয়স্ক লোক তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ল—খবরটবর না দিয়েই। এটা ঘটল তার কারণ, এক তো এখন সিধুর মতো কোনো দ্বারী নেই; তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, লোকটির চালচলনে এমন একটা ঔদ্ধত্য ছিল, মনে হয় না যে দ্বারী থাকলেও মানা শুনত।

ঢুকেই লোকটি দেখল, দেববর্মা যথারীতি তাঁর চৌকিতে বসে আছেন জানলার দিকে পিঠ করে। ছেলেরা মেঝের ওপর গোল হয়ে বসে তাঁর কথা শুনছে। এই পনেরো বছরেও—সময়টা মোটেই কম নয়, কেননা কোনো রাজ্যের বিধানসভার তিন-তিনটে নির্বাচন এবং রাজতন্ত্রের অদল-বদল হয়ে যাওয়ার কথা—দেববর্মার পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় সত্ত্বেও তাঁর দেহমনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

আগন্তুক দেখল যে, ঘরে চেয়ার-টেয়ার নেই, বসতে হলে ছেলেদের পিছনে, যা তার পক্ষে একরকম অসম্ভব। সুতরাং সে দাঁড়িয়ে থাকাই মনস্থ করল এবং দুহাত জড়ো করে নমস্কার করল। দেখা গেল যে তার ডান হাতের আঙুলে নানা রকমের পাথর বসানো তিনটে আঙটি। এটা কি তার দৈবে বিশ্বাস বোঝায়? হবেও বা, কারণ সুযোগের সমাপতন যদি দৈবানুগ্রহ হয়, তাহলে অপরপক্ষে সুযোগ করায়ত্ত করার ক্ষমতাকে পুরুষকারও বলতে হবে বইকি। আগন্তুকের দুইই ছিল।

যাই হোক, দেববর্মা তাকে বিনত হতে দেখে অভ্যাসবশত হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, 'কে তুমি, কী চাও?…'

'আজ্ঞে, আমি আপনার সেবক, শিষ্য। বর্তমানে কোনো কাজ নিয়ে আসি নি, কেবল আপনাকে দেখতে এসেছি…'

'ও…' দেববর্মার মুখে একটু প্রসন্ন হাসি দেখা দিল, তারপর তিনি আবার ছেলেদের বলতে শুরু করলেন। কিন্তু ছেলেরা একটু অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল; যদিও আগন্তুক তাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের শিষ্য বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল এবং সে হিসেবে সে তাদের সতীর্থই বটে, কিন্তু কেমন করে তাদের মনে হতে লাগল সে ঠিক তাদের সজাতীয় নয়। ফলে তাদের মনোযোগ ক্ষুণ্ণ হতে থাকল।

আগন্তুক যখন দেখল যে দেববর্মা তাকে আমলই দিলেন না, তাকে যে-কেউ একটা সাধারণ লোক বলেই ভেবে নিয়েছেন, তখন তার খুব অভিমান হল। বলল, 'দেবদা, আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি আপনার সুরো, সুরেন্দ্র…'

'তুমি সুরো! কী আশ্চর্য…এসো, এসো, ওখানে কেন, আমার পাশে বোসো…' বলে দেববর্মা বিছানার ওপর চাপড়ে দিলেন, স্থাননির্দেশের জন্য।

'আসছি, দেবদা…'

মনে হল, এতক্ষণে সুরেন্দ্র একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। সে ছেলেদের পাক দিয়ে চৌকির কাছে এল, দেববর্মার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল—ইতস্তত, কেননা সেসব দিনে দেবদার সঙ্গে একাসনে বসবার কথা সুরেন্দ্র ভাবতেই পারত না। কিন্তু এখন কিনা তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, তাই সে বেশ সপ্রতিভভাবে বসে পড়ল।

দেববর্মা তাঁর পাশে ফেলে রাখা চশমাটা তুলে চোখে লাগালেন, ভালো করে দেখার জন্য। মৃদু হেসে বললেন, 'তাই বল, তোমাকে যে প্রথম চিনতে পারি নি, সেটা আমার দোষ নয়…তা তুমি বেশ স্ফীত হয়েছ, বল?'

এতক্ষণ ছেলেরা অবাক হয়ে আগন্তুককে দেখছিল—কোঁচানো ধুতি পকেটে পোরা, সিল্কের পানজাবির ওপর নানা সূক্ষ্ম কাজ-করা কাশ্মীরী শাল, জমকালো চেহারা—তাদের বিস্ময়াহত হবার কথাই বটে। এখন দেববর্মার কথা শুনে তারা মুখ টিপে হাসল।

সুরেন্দ্র সেসব লক্ষ করছিল না, জীবনে সার্থক ব্যক্তির মতো স্মিতমুখে নিজের আঙটি-জড়ানো

আঙুলগুলোর দিকেই তাকিয়েছিল। দেববর্মা কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকেই তাকাচ্ছিলেন, আঙুল তুলে একটা পাতলাহাবানো ছেলেকে দেখালেন, 'ওই, ওই অজিতের মতোই ছিলে তুমি, অবিকল··· খুব চিকন, অথচ স্মার্ট, অনেস্ট এবং স্ট্রেট। আর এখন তুমি এত বদলে গেছ···না, কিছু মনে কোরো না, আমাকে বলতে দাও, তোমার চেহারার এই পৃথুল পরিবর্তন···আচ্ছা, এটা কি বংশগত?'

সুরেন্দ্র একটু ভাবিত হল, বলল, 'আমি খুব শৈশবে বাবাকে হারিয়েছিলাম, ঠিক মনে নেই। অবশ্য তাঁর ফটোগ্রাফ দেখেছি, তিনি খুব সাধারণ চেহারার মানুষ ছিলেন। তবে···' হঠাৎ যেন সুরেন্দ্রের মনে পড়ে গেছে এমনি উৎসাহপ্রদীপ্ত হয়ে বলল, 'তবে আমার বাবা নন, আমার পুত্র আমারই মতো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেটা তার মায়ের আদরে আর আমার যোগান পেয়ে, হেঁ-হেঁ···আপনার কাছে বলতে বাধা নেই, সে আমাকেও পেরিয়ে গেছে···'

ছেলেরা একটু হেসে উঠল। কিন্তু সুরেন্দ্র সেদিকে লক্ষ করল না, দেববর্মাও না। বললেন, 'দাঁড়াও, বংশধারায় আগে ছিল না, এখন এই স্ফীতি দেখা দিয়েছে, তাই তো? মিউটেশন-প্রক্রিয়ায় এটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাবছি, এটা মেনডেল-সূত্র, না পাভলভ···তাছাড়া, এটা উদ্বর্তন, না কি, অববর্তন?···'

'আজ্ঞে, কী বলছেন?···' সুরেন্দ্র সংশয়ী হয়ে উঠল, ঠিক বুঝতে পারল না, গুরু কোন্ পথে যাচ্ছেন।

'আচ্ছা, তোমার এই যে উদ্বর্তন বা অববর্তন, সেটা হল কী করে?···'

এ প্রশ্নে মুহূর্তে সুরেন্দ্রের বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেল, বলে উঠল, 'দেবদা, সেটা আপনারই শিক্ষাগুণে, আপনি যে ডায়লেকটিকস শিক্ষা দিয়েছিলেন···'

'আমার শিক্ষাগুণে! ডায়লেকটিকস!···'

'হ্যাঁ, দেবদা, এটা আমি সিধুদার কাছ থেকেও শুনেছিলাম। একদিন আপনি দেয়ালে একটা টিকটিকি দেখেছিলেন, শিকার ধরছিল। সিধুদা তাড়াতে যেতেই আপনি বারণ করেছিলেন, মনে পড়ছে আপনার?···'

'না তো। কিন্তু হবেও বা···তারপর?'

'তারপর খুব সোজা। টিকটিকিকে খাবার খেতে দিতে হবেই, তা না হলে ইউনিটি অব অপোজিটস এই সূত্র অচল হয়ে যায়। তখন আমি বুঝলাম, টিকটিকির খাওয়া দরকার, পোকারও তেমনি খাওয়া দরকার, খাদ্য-খাদকের একটা শৃঙ্খল-রচনা দরকার, উভয়ের বিরোধ অথচ সহাবস্থান···সেই থেকে আমি খাওয়ানোর এবং খাওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী। এবং আপনার কাছে স্বীকার করতে বাধা নাই, আমিও খেয়েছি, খেতেও দিয়েছি···'

দেববর্মা হেসে উঠলেন।—'ইনটারেস্টিং···'

'দেবদা, আপনি হাসছেন!···'

'আহা, হাসছি না। এখন বলো তো ভাই, দু-একটা নমুনা দাও তো শুনি, কী রকম খাওয়া-খাওয়ি করেছ···'

'তাই আদেশ করুন। দু-একটা কেন, আমি বিশ-পঁচিশটা গড়গড় করে বলতে পারি। প্রথমেই ধরুন ধনের কথা। এ হচ্ছে ধনতন্ত্রের যুগ। আমি পোকাকে বললাম, তোমরা ধন-কামনা কর, দাবি-দাওয়া তোল, সংঘবদ্ধ হও। আমি তোমাদের সংগঠন করে দেব এবং ধনদর্শন করাব। পক্ষান্তরে, টিকটিকিকে বললাম, ধন খাটিয়ে আরো ধনী হও, আর আমাকে তার সূত্রধার হতে দাও। তা না হলে শতরনজ খেলা ঠিক জমবে না। খেলাটা অবশ্য বিচিত্র-জটিল, মনোপলির সঙ্গে ছোটো ক্যাপিট্যালের, মাল্টি-ন্যাশন্যালের সঙ্গে ন্যাশন্যালের, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের লড়াই·· লড়াই-লড়াই-লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই···'

'বেশ মজার খেলা তো। তুমি আর কী খেলেছ?···'

'ওদের সঙ্গে আমাদের অহরহ নতুন-নতুন খেলাই তো চলছে। ধরুন, দুর্নীতি। ওরা দুর্নীতিপরায়ণ, সেটা সবাই জানে। এখন লড়াইটা হবে কী দিয়ে? যারা সরল, মানে নির্বোধ, তারা বলবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনীতির। কিন্তু ডায়লেকটিকস অত সোজা নয়। ওটা যেমন কঠিন, তেমনি জটিল। আমি ওটাকে এইভাবে সাজালাম: ওদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের দুর্নীতি, মালিকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবীর দুর্নীতি, অর্থাৎ বিষে বিষক্ষয়, সবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবার দুর্নীতি, সর্বত্র দুর্নীতি। এর ফল কী হল, মানে কী করতে পেরেছি? ওই যে কবি বলেছেন, পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে···তা আপনি এখন যেদিকে চাইবেন, ব্যক্তির পর ব্যক্তি, বিভাগের পর বিভাগ, ব্যবসায়ের পর ব্যবসায়, স্কুল থেকে কলেজ, ওষুধ থেকে বিষুধ, মানে ডাক্তার থেকে হাসপাতাল···'

ছেলেদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'দেবদা, এটা কি ডায়লেকটিকস?···'

সুরেন্দ্র মুহূর্তের জন্য ছেলেটার দিকে কটমট করে তাকাল, কিন্তু পরমুহূর্তে দেববর্মার দিকে ফিরে তার মুখখানা আবার মোলায়েম হয়ে উঠল। বলল, দেবদা, তত্ত্বের প্রামাণ্যতা কর্মের মধ্যে। ধরুন আর-একটা বিষয়—ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা আর দেশবিভাগ। ওরা নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশবিভাগ করতে উদ্যত হল; তখন আমরা কী করলাম? বললাম কি যে দেশ-বিভাগ রুখব? মোটেই তা নয়, পোকাকেও তার খাবার দিতে হবে; এবার তার অর্থ বুঝলেন তো? আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা পাকিস্তান সমর্থন করেছিলাম। সে অনেক কালের কথা। সম্প্রতি কী হচ্ছে? ওরা ভোটের জন্য একবার হিন্দুদের উস্কায়, আবার মুসলমানদের। আমরা ভোট চাই না তা নয়, কিন্তু আমরা চাই অসাম্প্রদায়িকতা। সেটা কী রকম? আমরা চাই হিন্দু ভোট কিন্তু হিন্দু অসাম্প্রদায়িক ভোট; আমরা চাই মুসলিম ভোট কিন্তু মুসলিম অসাম্প্রদায়িক ভোট। এবং·· আরো শুনুন। ওরা সুবিধাবাদী, ওদের দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা দরকার। কিন্তু ওদের দল বড়ো, আর আমাদের দল ছোটো, এইরকম অনেক ছোটো দল আছে। সুতরাং আমাদের জোট বাঁধতে হবে। কার সঙ্গে জোট বাঁধব? সেই এক সূত্র: সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সত্য-নিষ্ঠা বা ন্যায়ের নয়, সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সুবিধা-বাদ···'

'থামো, থামো, আমি আর শুনতে পারছি না। তুমি চলে যাও···'

ধমক খেয়ে ধড়মড় করে উঠে পড়ল সুরেন্দ্র। হাত কচলে বলল, 'দেবদা, আপনি আমার ওপর অকরুণ হবেন না। যেদিন আমি মার খেয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম, সেদিন আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজও দিচ্ছেন। অথচ আপনার শিক্ষাই আমাকে চালিয়ে নিয়েছে···'

'শিক্ষা আমি ঠিকই দিয়েছিলাম, কিন্তু উলটা বুঝলি রাম। তুমি আমার মুখ দেখতে চাইছ, কিন্তু তাকাচ্ছ আয়নার দিকে, দেখছ নিজেকেই। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্···'

'সংস্কৃত বলছেন? ও ভাষাটা শেখা হয় নি··· বাঙালির ছেলে বাঙলা জানি, ইংরেজি শিখেছি, জার্মানও জানি কতক কেমন···'

'সংস্কৃত জান না, ক্ষতি নেই। ওই বাক্যটার মানে হচ্ছে, যে যেমন ভজনা করে সে তেমন ফললাভ করে। তুমি যে হৃষ্টপুষ্ট একটি টিকটিকি হয়ে উঠেছ সে তোমারই বুভুক্ষাজনিত···'

'কী বললেন···' সুরেন্দ্র যেন ডিগবাজি খেয়ে গেল। দেববর্মার কাছে আসাটা এইরকম ফল প্রসব করবে তা সে আদৌ আশঙ্কা করে নি—তাও এতদিন পরে আসা! বস্তুত এতে সে খানিকটা রেগেই উঠল।—'সবই আমার বুঝবার ভুল। এমনও তো হতে পারে, আপনিই ভুল করছেন? কর্মেই তত্ত্বের যাচাই হয়··· আপনি সোনাপুরকে বিশুদ্ধ গ্রাম রাখতে চেয়েছিলেন,

পেরেছেন? কিছু মনে করবেন না, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনি আজও ক্লাশ নিচ্ছেন বটে, কিন্তু, কিন্তু…'

'আমি আর কদিন বাঁচব, এই বলতে চাও তো? মূর্খ, তুমি এটা বুঝতে পারছ না কেন, দেববর্মা মরলেও গুরু মরেন না, ডায়লেকটিকস মিথ্যা হয় না। তুমি গুরুদেবের বচন উদ্ধৃত করতে পারঙ্গম হয়েছ দেখছি। সেই তিনিই বলেছিলেন, তোমায় নতুন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণেক্ষণ, ও মোর ভালোবাসার ধন…'

'আজ্ঞে, ও-কথাটির অর্থ কী হল?…'

'অর্থ হল, তোমাকে যা শিক্ষা দিয়েছিলাম, সেটা যতই তুমি ভেস্তে দাও, যতই তার উলটো কর, সে শিক্ষা আবার দেখা দেবে, সেটা কখনো মরতে পারে না…'

'কিন্তু দেবদা, সেটা আমরাই তো করে তুলব, না কি?…'

'না, তোমরা না, পারবে না। ওইসব ছেলেরা… ওই যে অজিত, যে ছেলেটিকে তোমায় দেখালাম, এবং তুমি একদা যে-রকম ছিলে…ওরাই তোমার বিপরীতে দাঁড়াবে। ওরাই আমার শিক্ষাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে…'

'ও ..' সুরেন্দ্র ঢোক গিলে স্তব্ধ হয়ে রইল॥

গণমাধ্যম ও লোকসংস্কৃতি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃতি অর্থে আমরা বুঝি এবংবিধ জীবনচর্যা, যা মানুষকে নিয়ত উন্নতির পথে নিয়ে যায়। সেই অর্থে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা—সমস্ত কিছুই সংস্কৃতির অঙ্গ। সংস্কৃতি তো লোকের জন্যই, তাহলে লোকসংস্কৃতি বস্তুটি কী?

লোকসংস্কৃতি হল সেই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত বা নৃত্যকলা—যা রাজা বা অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতার তোয়াক্কা না করে সমাজের মধ্যে বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতি মানব-ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই গড়ে উঠেছে। যেদিন সে বনের বাঘ আর হরিণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার গুহার দেওয়ালটি ভরিয়ে তুলেছিল ধাবমান বাঘ এবং হরিণের ছবিতে, সেদিন থেকে নিজের অজান্তেই লোকচিত্রের জন্ম দিয়েছিল। অথবা যেদিন উৎসবমুখরিত রাত্রিতে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম নরনারী এক হয়ে সমস্বরে ধ্বনিত করে তুলেছিল তাদের অন্তরের আনন্দকে, সেদিন সে জন্ম দিয়েছিল বিশ্বের প্রথম লোকসঙ্গীতের।

চিত্রকলা, নৃত্য ও শিল্পের তুলনায় সাহিত্য যে অনেক পরবর্তী কালের, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকসাহিত্যের কবে যে উদ্ভব হয়েছিল তা বলা যায় না। লোকসাহিত্যের প্রলক্ষণ হল, তা মানুষের মুখে-মুখে প্রচারিত হয়ে থাকে। তার রচয়িতা এক সময় কেউ ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে বিরাট জনস্রোতে ব্যক্তি কোথায় হারিয়ে যায়। তা পরিণত হয় জনগণের সম্পত্তিতে। তার কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই; সম্প্রদায় নেই। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে তা প্রচারিত হয়। কখনও সে আঞ্চলিকতার মধ্যে বাঁধা পড়ে; কখনও ক্ষুদ্র সমাজগোষ্ঠী থেকে বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন ধরা যাক—বাঙলা ছেলেভুলানো ছড়াগুলি। সেগুলি অবিভক্ত বাঙলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার "ময়মনসিং-গীতিকা"র কথা ধরা যাক, তা আবদ্ধ হয়েছিল ময়মনসিং-এর আঞ্চলিকতার মধ্যে। গম্ভীরা গানও

মালদহের বাইরে যায় নি। কিন্তু ভাদু গান বা টুসু—রাঢ় অঞ্চলের সমগ্র এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে।

লোকসাহিত্যের বড়ো একটি সম্পদ লোকমাধ্যম। ইংরাজিতে যাকে বলে "লিভিং মিডিয়া"। মানুষ মুখে-মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে লোকসাহিত্যকে।

এই যে বিশাল রামায়ণ আর মহাভারত, লোকমাধ্যম না থাকলে তা পুঁথি হয়ে পড়ে থাকত রাজা কিংবা ধনীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থগুলির যে দশা হয়েছিল, গির্জা কিংবা মন্দিরের যাজক, পুরোহিত বা পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে তা পড়ে ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। ছাপাখানা তো এল এই সেদিন। আমাদের দেশে ছাপাখানার পত্তন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে।

তার আগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে—এক অসামান্য মূল্যবান সাংস্কৃতিক জীবনের পরম্পরা বহন করে চলেছে যে ভারতবর্ষ, আপনারা কি মনে করেন তা সম্ভব হত যদি দেশের জনগণ সচেতন আর সুশিক্ষিত না হয়ে উঠতেন? লোকশিল্প ছাড়া ওই শিক্ষা কি সম্পূর্ণ হত?

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যাঁরা শুধু রাজা-রাজড়ার ইতিহাস বলে মনে করেন, আমি তাঁদের দলে নই। ভারতের ইতিহাস শুধু কিছু বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের ইতিহাসও নয়। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ নিরক্ষরতা আর অজ্ঞানতার তিমির অন্ধকারে ডুবে ছিল—এসব বিদেশী উলেমা আর পাদরিদের রটনা। আমরা আজ যাকে "নন-ফরমাল এডুকেশন" বলি, ভারতবর্ষে সেটি পূর্ণমাত্রায় ছিল। এই শিক্ষা সম্ভব হয়েছে লোকমাধ্যমের নিরন্তর প্রয়াসে। গোটা রামায়ণ-মহাভারতকে এই লোকশিল্পীরা জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। কখনও গান করে, কখনও অভিনয় করে। শুধু রামায়ণ-মহাভারত নয়; পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনের মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন এবং সাহিত্যের সার কথাগুলি জনগণকে তাঁরা জনগণের ভাষায় বুঝিয়েছেন। এর ফলে একটি শিক্ষিত সমাজগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে যারা মূল্যবোধ গড়ে তুলেছে, জীবনবোধ গড়ে তুলেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য হল জীবনকে কতগুলি মূল্যবোধের আলোকে উদ্দীপ্ত করা। সৎ খাঁটি মানুষ তৈরি করা। লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা তা হয়তো সাক্ষরতা দেয় নি, কিন্তু মানুষের চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনে সাহায্য করেছে। একথা তো স্বীকার করবেন, আপোকার মানুষেরা মানুষ হিসাবে অনেক গভীর মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। আইনশৃঙ্খলা কখনও সুখী জীবনযাত্রার অন্তরায় হয় নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উচ্চবর্ণের কিছু মানুষের কাছ থেকে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও শতকরা ৮০ জন হিন্দুই ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নি। লোকমাধ্যমই আমাদের শাস্ত্র ও সাহিত্যের মর্মকথা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেছে।

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ যে ছেলে-ভুলানো ছড়া, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের গীতি বা গান, যা একক মানুষের জন্য আবার যৌথ শিল্পীদের জন্য। অধিকাংশ কবি বা গীতিকারই হারিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টি শুধু নিছক বিনোদন ছিল না। তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল এক নতুন রূপময় কল্পনার জগৎ। কখনও আনন্দ, কখনও বেদনার অভিব্যক্তি—যা ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়ে এক সার্বজনীন উপলব্ধির পারে শ্রোতাকে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহিত্যে যে একাশিটি ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি কতকাল ধরে আজও পর্যন্ত সমস্ত শিশুর সামনে এক অনাস্বাদিত বিস্ময়কর স্বপ্নময় জগতের সন্ধান দিয়ে আসছে। এগুলিকে "ননসেন্স ভার্স" বলে ছোটো করে দেখলে চলবে না। 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' অথবা 'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো'—এইসব ছড়ার মধ্য দিয়ে চকিতে যে কাল্পনিক চরিত্র-

গুলির সঙ্গে শিশুমনের সংযোগ তৈরি হয়ে যায়, তা সারা জীবন ধরে তার মধ্যে অনুরণিত হতে থাকে। শৈশব হয়ে ওঠে মধুময়। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান / শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান।' —এই ছড়াটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই চারটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘাচ্ছন্ন বাদলার দিন এবং উত্তাল তরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পরে দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটি ছুয়েক পানসি নৌকা বাঁধা আছে এবং শিব ঠাকুরের নববিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন।'

কিন্তু আজ আমাদের শিশুরা সেই শিবঠাকুরের আপন দেশ থেকে নির্বাসিত। আজ ছেলেমেয়েদের রূপকথার গল্প শোনাবার মতো বাবা-মায়ের সময় নেই। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার সেই ঝুলিটিও নেই, কারণ ঠাকুরদা ও ঠাকুমারা পারমাণবিক পরিবারের সুখী গৃহকোণ থেকে নির্বাসিত। তাঁদের স্থান দেশের বাড়িতে অথবা শহরের বৃদ্ধাশ্রমে। ছেলেভুলানো ছড়ার বদলে এখন শিশুরা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের গান মুখস্থ করে। গান নয়, শ্লোগান।

কেউ-কেউ প্রশ্ন তোলেন—এযুগে কত ভালো-ভালো সাহিত্য হচ্ছে, নতুন লোকসাহিত্য আর হচ্ছে না কেন? এ যেন সেই প্রশ্ন; আর রবীন্দ্রসঙ্গীত লেখা হচ্ছে না কেন? লোকসঙ্গীত তো শারদীয় সংখ্যার সম্পূর্ণ উপন্যাস নয় যে সম্পাদকের ফরমায়েশে লেখা হবে। তা তৈরি হয় আপনা-আপনি। মুখে-মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে। তার স্থান তো ধনবানের বুকসেলফে নয়—প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে আর জায়গা নেই। 'নো রুম ফর ওয়াইল্ড্ অ্যানিমেল'। আসলে লোকসাহিত্য তৈরি করার লোক নেই। শোনার লোকও ক্রমশ কমছে।

আপনারা কি কখনও ভেবেছেন উনিশ শতাব্দী পর্যন্তও বৈষ্ণবপদাবলী লেখা হয়েছে। বিশ শতকে এসেই এই ধারা থেমে গেল কেন? উনিশ শতকেও খণ্ডকাব্য লেখা হয়েছে। বিশ শতক শুধু গীতিকাব্যের শতক হয়েই রইল কেন? উনিশ শতকের ইংরাজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালি যদি "বৃত্রসংহার" কিংবা "মেঘনাদবধ" কাব্য বুঝতে পারেন, উপভোগ করতে পারেন, তাহলে এই শতাব্দীতে কেন কবিরা খণ্ডকাব্য লিখতে সাহস করলেন না? একটা কারণ ওই সময়াভাব। না, কবির নয়—পাঠকের। এখনকার পাঠক ধনীর দুলালের মতো। তাকে ভোজের আসরে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেওয়া হয়। তিনি এটা একটু চাখেন, ওটা একটু চাখেন। এক কথায়, পরিপূর্ণভাবে খাদ্য উপভোগ করার মতো মেজাজ তাঁর নেই। আগে সাহিত্যে বাছাইয়ের সুযোগ কম ছিল। তাই আমরা সুগভীর লেখক শুধু নয়, সুগভীর অর্থাৎ ইনডেপথ্ পাঠকও পেয়েছি।

দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্য কিছু-কিছু এখনও রচিত হচ্ছে। একতারা বাজিয়ে যে বাউলটি গ্রামে-গ্রামে গান করেন, যে পল্লীগায়ক কবি জলসায়-জলসায় গান করেন, তিনি যে কিছু স্বরচিত গান শোনাচ্ছেন না, তা নয়। কিন্তু তা মুখে-মুখে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে না কেন? তার কারণ লোকমাধ্যমের এখন অভাব ঘটেছে। গণমাধ্যমের কাছে লোকমাধ্যম সিংহের সামনে মেষশাবকের মতো গুটিয়ে গেছে।

গণমাধ্যম লোকমাধ্যমকে ধীরে-ধীরে হত্যা করছে। প্রথম কথা, গণমাধ্যম জনসাধারণের কাছে এমন ধারণার সৃষ্টি করে দিচ্ছে—যা গণমাধ্যমবাহিত নয়, তা শ্রেষ্ঠ নয়।

এতদিন দরবারি সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতিকে আমল দিত না, কিন্তু তার শক্তিকে খর্ব করার চেষ্টা করে নি। গণমাধ্যম এসে লোকসংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলল। গণমাধ্যমের প্রবণতা মনোপলির। সংস্কৃতিকে কুক্ষিগত করে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাকে ব্যবহার করা। গণমাধ্যমের আর-একটি উদ্দেশ্য হল

পাঠককে বিজ্ঞাপনদাতার কাছে বিক্রি করা। পাঠকের সংখ্যা যত বেশি হবে বিজ্ঞাপনদাতার কাছে তার বাজারদরও তত চড়বে। আর পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে সব জাদুকর যেটি বলেন, সেই কথাটি বলতে হয়—অর্থাৎ, 'আমিই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর।'

গণমাধ্যম দরবারি সংস্কৃতির মতো যদি নিজের স্বরাজ্যের মধ্যেই স্বরাট হত তাহলে আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু সে যখন লোকসংস্কৃতির দিকে হাত বাড়াতে শুরু করল, তখনই হল বিপদ।

টেলিভিশনে কিংবা বেতারে যে কীর্তনিয়ার কীর্তন প্রচারিত হয়, যে বাউলকে বার-বার প্রজেক্ট করা হয়, যে যাত্রাপালা বার-বার দেখানো হয়, জনসাধারণ তাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তার বাইরে লোকসংস্কৃতির বিরাট জগৎটিকে জনসাধারণ অবজ্ঞার চোখে দেখেন। তিনি পল্লীগীতি শুনতে হলে নামি শিল্পীর ক্যাসেট কেনেন, কিন্তু যে পল্লীগায়ক এখনও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি বেতার- বা দূরদর্শন-শিল্পীর চেয়ে অনেক উন্নতমানের গায়ক হলেও, তিনি অবজ্ঞাত থেকে যান।

আমাকে একজন সেলসম্যান বলেছিলেন, তিনি একটি প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য যখন রিটেইলারদের কাছে যেতেন, তখন তাঁদের কাছ থেকে প্রায়ই একটি কথা শুনতে হত—'ইয়ে টিভি মে আয়া তো?' তেমনি এ-যুগের লোকসঙ্গীতশিল্পীর নাম বললেই বলবেন, উনি আবার কে? টিভিতে কি ওঁকে দেখা যায়?

টিভিতে সিরিয়াল প্রচারিত না হলে, সাক্ষাৎকার না প্রচারিত হলে, তিনি কিসের সাহিত্যিক? নামি গণমাধ্যমে লেখা না বেরুলে তিনি লেখকপদবাচ্যই নন। আর যিনি লেখকপদবাচ্যই নন, তাঁর লেখা খুঁটিয়ে পড়তে পাঠকের দায় পড়েছে। একজন অজ্ঞাত লোকসঙ্গীতশিল্পী চিরকাল ভিক্ষুকই থেকে গেলেন। ভিক্ষুক গায়ক তবু দরজায়-দরজায় ঘুরে ভিক্ষের ঝুলি ভরতি করেন, কিন্তু ওই গানটি যিনি লিখেছিলেন, সেই অবজ্ঞাত উপেক্ষিত এবং চরমহতভাগ্য কবির কথা একবার চিন্তা করুন। তাঁর নাম হারিয়ে গেল কালের গর্ভে, পরিশ্রমের কোনো অর্থমূল্যও তিনি পেলেন না। তবু তিনি লিখেছিলেন কেন? লিখেছিলেন মনের আনন্দে। প্রাণের আবেগে। কোনো খ্যাতির প্রত্যাশা না করে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমরা যারা পেশাদার লেখক, তারা খ্যাতির জন্য লিখি, অর্থের জন্য লিখি। আনন্দের জন্য লিখি না। অথবা এইভাবে বলা যায় যে আনন্দটা আসে, সেটি আসে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। কিন্তু লোকসাহিত্যকার যখন লেখেন, তখন লেখেন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থেকে। কস্তুরী মৃগের মতো বিনা আয়াসেই তিনি তাঁর আপন গন্ধে পাগল হয়ে ফেরেন। এই আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকাটাই তাঁর পুরস্কার।

কিন্তু গণসংস্কৃতি ক্রমশ লোকসংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করবে। পশ্চিমে এটা হয়েছে। সেদেশে খাঁটি লোকসংস্কৃতি বলতে কিছুই টিঁকে নেই। লোকসঙ্গীত লোকসাহিত্য সম্পূর্ণভাবে গণমাধ্যমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরুষ হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ার ফলে লোকসংস্কৃতির বিশুদ্ধতা আর অবশিষ্ট নেই। আগে গান গেয়ে মাঝি দাঁড় টানত। এখনও মাঝি গান গায়—তবে ভাটিয়ালি নয়, সিনেমার গান।

আমি সাহিত্যের ছুঁৎমার্গিতায় বিশ্বাসী নই। গণমাধ্যম লোকসংস্কৃতির যদি প্রচার করে অথবা আধুনিক সঙ্গীতে যদি লোকসঙ্গীতের সুরের প্রভাব লাগে, তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। কিন্তু খাঁটি লোকসংস্কৃতিকে মেরে তার মূর্তি গড়িয়ে পুজো করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি দেখি না। আমেরিকায়, দক্ষিণ কোরিয়ায়, আরও অনেক দেশে আজকাল কালচারাল ভিলেজ গড়ে তোলা একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। ওখানে বিভিন্ন উপজাতিদের ভাড়া করে এনে রেখে দেওয়া হয়, পর্যটকদের দেখানোর জন্য। লোকসংস্কৃতিকে এইভাবে পণ্য করার আমি বিরোধী। লোকসংস্কৃতিকে লোকচক্ষুর অন্তরালেই বাড়তে দিতে

হয়। কিন্তু বৃদ্ধি মানে লম্বায় বাড়া নয়, তাহলে তো নারকেলগাছকেই মহীরুহ বলা হত। বৃদ্ধি মানে পুষ্টি ও সমৃদ্ধি এবং তার পথ একমুখী নয়। বটগাছ পত্রপুষ্পে পল্লবিত হয়ে ওঠে বলেই সে বনস্পতি। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য থেকে জাতি যদি জাতীয় মূল্যবোধের রস না গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সে লোকসংস্কৃতির কোনো মূল্য নেই।

গণমাধ্যমবাহিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেখানে আমাদের বেশিদূর নিয়ে যেতে পারছে না, সেখানে 'দাও ফিরে সে অরণ্যে'র মতো আমাদের বলতে ইচ্ছে হয় : দাও ফিরে সেই "লোকসাহিত্য", সেই রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-পঞ্চতন্ত্র / হিতোপদেশ-ঈশপের গল্প। দাও ফিরে সেই বৈষ্ণব গীতিকবিতা, মঙ্গলকাব্য। ছোটোবেলায় ভক্তিভরে মায়ের সঙ্গে শুনতে যেতাম গান-পাঁচালি-কথকতা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই ট্র্যাডিশন চলেছে অথচ যা কখনও পুরনো হবার নয়, যা শাশ্বত, চিরন্তন, ধ্রুব। যা আরোপিত নয়, অন্তর্নিহিত। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, 'সূর্য যখন ডুবে যায় তখনই পতঙ্গ নিভৃত আলোকবর্তিকা খোঁজে।'

আমাদের সংস্কৃতির সূর্য ডুবুডুবু। এই গোধূলিবেলায় কি নিভৃত আলোকবর্তিকা খোঁজার সময় শুরু হয় নি? লোকসাহিত্য আর লোকসংস্কৃতির ভীরু দীপশিখা গণসংস্কৃতির দমকা ঝড়ে নিভে গেছে বলেই আর-একটি আলোকবর্তিকার সন্ধান আমাদের তাই এত জরুরি হয়ে উঠেছে।

সমস্ত মানুষকে আজ তাই সচেতন আর সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে সৎ সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অনুকূলে। যা গণমাধ্যমবাহিত একমাত্র তাই-ই শ্রেষ্ঠ নয়। গণমাধ্যমের চোখধাঁধানো গ্ল্যামারের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হবে।

আসুন, আমরা না হয় খ্যাপার মতোই পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াই। অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে একবার দেখি কোথায় ছড়িয়ে আছে সৎ সাহিত্যের উপাদান। অথবা গুপ্তধনের নকশা খুঁজে বেড়াবার মতো আমরা যেন খুঁজে-খুঁজে বেড়াই সেই সাহিত্যকে যার মধ্যে গ্ল্যামার নেই, কিন্তু আছে প্রাণের স্পর্শ। আছে মাটির গন্ধ। যা গণমাধ্যমের ফরমায়েসি নয়।

সৎ সাহিত্যের জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে ঐতিহ্যের কাছে। ঐতিহ্যবিরোধিতা, উদ্মার্গগামিতা ও কেন্দ্রচ্যুত জীবনধারণা কখনোই সৎ সাহিত্য গড়ে তুলতে পারে না। বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখকরা মনে করতেন, ঐতিহ্যবিরোধিতা থেকেই বৈপ্লবিক সাহিত্য গড়ে ওঠে। কিন্তু তাঁদের সেই ধারণা এখন ভেঙে যাচ্ছে।

সোভিয়েত লেখক য়ুরি বন্দারেভ বলছেন, 'ঐতিহ্যকে ধ্রুবতারা না করলে কোনো প্রতিভামণ্ডিত অভিনব বা স্থায়ী কিছু সৃষ্টি করা যায় না। সেই তারা হল মহাবিপ্লবের অনির্বাণ জ্যোতি।' অসুস্থ-স্বল্প বিকারতত্ত্ব, অর্থহীন শৈলীবর্জিত কতগুলি কথার স্রোত, কথা দিয়ে ভাঁড়ামো আর খেলা করা, আধুনিকপন্থী চিত্রকলার সৃষ্টিতে রঙ দিয়ে মিথ্যা আর দুর্বোধ্যের ভেলকি, সংগীতের বদলে লাইনচ্যুত ট্রেনের ঘটঘটানির ঘর্ঘর শব্দ আর যন্ত্রণাবিদ্ধ পশুর আর্তনাদের মতো আওয়াজ—এগুলিই নাকি আজকের মানুষের বাস্তবতাবোধের প্রতিকল্প ও প্রতীক। এ হল অনুভূতির জগতে অসুস্থতাজনিত বিকার।

আসুন, আবার আমরা আমাদের শুভ বিচারশক্তিকে জাগ্রত করি। গণমাধ্যমের চামচ করে যে সাহিত্য প্রতিনিয়ত আমাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাকে অমৃত মনে না করে আমরা গ্রন্থাগারগুলি খুঁজে নিজেরাই নিজেদের মানসিক খাদ্য আহরণ করি। আমরা অখ্যাত লোকশিল্পীর কাছে নিজেরাই চলে যাই। তাঁদের আবিষ্কার করি। কোন্ সাহিত্য সৎ, কোন্ সাহিত্য মঙ্গলকর, তা বিচারের চাবিকাঠি আপনার হাতেই। আপনি শুধু নিজেকেই তিনটি প্রশ্ন করুন : (১) এই সাহিত্যপাঠে আপনার মন অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে

কিনা? (২) এই সাহিত্য আপনাকে ভাবাচ্ছে কি না? (৩) এই সাহিত্য আপনার অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানকে, বিশালের সঙ্গে ক্ষুদ্রকে ও সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিসত্তার কোনো মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছে কিনা? যদি পেরে থাকে তবেই সেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি সার্থক।

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক ও লেখক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতা পড়িয়েছেন। একাধারে ঔপন্যাসিক (প্রতিনায়ক, নিঃসঙ্গ পদাতিক), ছোটোগল্পকার, (নির্বাচিত সরস গল্প, আমার প্রিয় গল্প), নাট্যকার (স্বর্ণভিলা) ও অজস্র প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনার লেখক। মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশেষ সংবাদদাতারূপে নিয়োজিত।

মসীযুদ্ধের সৈনিক : প্রেমচন্দ

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

প্রেমচন্দ ছাপ্পান্ন বছর বয়সে ১৯৩৬ সালে ৮ অক্টোবর মারা যান (জ. ৩১ জুলাই, ১৮৮০)। তাঁর মৃত্যুর ঠিক তেত্রিশ বছর আগে ওই ৮ অক্টোবর তারিখেই তাঁর প্রথম উপন্যাস, উর্দুতে লেখা, "অসরারে মাবিদ" ধারাবাহিকভাবে ছাপা শুরু হয় বারাণসীর এক সাপ্তাহিক পত্রিকায়। লেখকের নাম ছিল 'ধনপত রায় ওরফে নবাব রায় অলাহাবাদী'। ১৯০৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে তিনি হিন্দিতে বারোখানি উপন্যাস রচনা করেন, শ তিনেক ছোটোগল্প আর উর্দুতে খানতিনেক মৌলিক উপন্যাস লেখেন। এ ছাড়া, তাঁর মৃত্যুর পর তিন খণ্ডে বেরিয়েছে তাঁর আটশোখানেক প্রবন্ধ, ভাষণ, গ্রন্থসমালোচনা, শোকসমাচার ইত্যাদি। সুতরাং তাঁর রচনার পরিমাণ খুব কম নয়। রচনার পরিমাণে যদিও প্রেমচন্দের যথার্থ পরিচয় নয়। হিন্দি বা সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে প্রেমচন্দের ভূমিকানির্ণয় একটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় নিঃসন্দেহে। তবে যে-বাঙালি পাঠক প্রেমচন্দের কিছু রচনা পড়েছেন বা তাঁর নাম শুনেছেন, তাঁদের অধিকাংশের মনে প্রেমচন্দকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। তার একটি কারণ উভয় লেখকই প্রায় সমসাময়িক—শরৎচন্দ্র ১৮৭৬ থেকে ১৯৩৮ আর প্রেমচন্দ ১৮৮০ থেকে ১৯৩৬। কিন্তু একমাত্র সমসাময়িকতাই তুলনার কারণ হতে পারে না। তবে কেবল বাঙালি পাঠককুলকেই দোষ দিয়ে লাভ কী। সম্প্রতি বাঙলায় লিখিত একটি "হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থেও[১] দেখা যাচ্ছে, 'অতঃপর হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচাঁদের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দী উপন্যাস ও ছোটোগল্পের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটে তাঁর লেখনীস্পর্শে। শোষিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের জীবনের করুণ দিক্‌টি মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন তিনি। তাই রাশিয়ার ম্যাক্‌সিম গোর্কী (১৮৬৮-১৯৩৩ [১৯৩৬]) ও বাংলার শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) সঙ্গে তাঁর তুলনা দেওয়া হয় ঔপন্যাসিক হিসাবে।' অথচ ১৯৩০ সালে জৈনেন্দ্রকুমারকে প্রেমচন্দ স্বয়ং বলেছিলেন, 'রবীন্দ্র এবং শরৎ দুজনেই মহৎ সাহিত্যিক।...কিন্তু হিন্দির পক্ষে তাঁদের ধারাই কি একমাত্র পথ।...আমার পক্ষে অন্ততপক্ষে, আমি জানি যে ওটি কোনোক্রমেই আমার পথ নয়।' এইখানেই তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য বলতে তিনি মেয়েলি হৃদয়াবেগের বাহুল্যই বোঝাতে চেয়েছিলেন। জৈনেন্দ্রকুমারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা নিঃসন্দেহে হিন্দিতে হয়েছিল। জৈনেন্দ্রকুমার তা হিন্দিতেই লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজি তর্জমায় দু জায়গায় দু রকম পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্য অকাদেমি-প্রকাশিত প্রকাশচন্দ্র গুপ্তের ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালার জীবনীতে দেখা যাচ্ছে, 'একমাত্র' বা only এবং 'কোনোক্রমেই' বা at all নেই, যা হরিশ ত্রিবেদী-কৃত অমৃত রায়ের[২] "প্রেমচন্দ : কলম কা সিপাহী" গ্রন্থের ইংরেজি তর্জমায় রয়েছে। ওই শব্দ দুটির ঝোঁক থাকা আর না-থাকায় বক্তব্যের চরিত্রে বড়ো মাপের পরিবর্তন ঘটে যায়। অনুবাদের প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে

PREMCHAND : His Life and Times—Amrit Rai. Tr. Harish Trivedi, Oxford University Press, Delhi, 1991, XI+[3]+413, Rs. 125/-.

প্রেমচন্দের এই স্পষ্ট মন্তব্য সত্ত্বেও সমালোচক, ইতিহাসকার বা পাঠকসম্প্রদায় প্রেমচন্দের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা নিয়ে আসেন। যার ফলে প্রেমচন্দ চর্চার গভীরতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে। পিতৃদত্ত নাম ধনপত রায়, প্রথমে লেখেন নবাব রায় ডাকনামে, পরে ১৯১০ সালে মুন্‌শি দয়ানারায়ণ নিগমের পরামর্শে হন "প্রেমচন্দ"। নতুন নামে প্রকাশিত প্রথম গল্প "বড়ে ঘর কি বেটি"। তারপর থেকে ওই নামেই পরিচিত হয়ে আসছেন। অথচ আজ পর্যন্ত "প্রেমচন্দ" নামটিও বাঙলায় এবং ইংরেজিতে কয়েকভাবে লেখা হয়ে থাকে। সাহিত্য অকাদেমি-প্রকাশিত প্রকাশচন্দ্র গুপ্তের বইয়ে আছে, "Prem Chand", অর্থাৎ 'প্রেম চন্দ', রামবহাল তেওয়ারীর "হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস"-এ 'প্রেমচাঁদ', কেউ-কেউ 'প্রেমচান্দ'-ও লেখেন, কোথাও 'প্রেমচন্দ্র'-ও দেখা গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের নাম নিয়ে এমন রকমফের কেউ ভাবতে পারেন ?

প্রেমচন্দচর্চার এমন অবস্থায় অক্সফোর্ড ইউনিভার-সিটি প্রেস ১৯৮২ সালে যখন অমৃত রায়ের হিন্দি গ্রন্থ "প্রেমচন্দ : কলম কা সিপাহী"-র হরিশ ত্রিবেদী-কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন তখন আশা এবং উৎসাহ বেড়েছে স্বাভাবিক কারণেই। অহিন্দি-ভাষীদের মধ্যে যাঁদের প্রধান ভরসা ইংরেজি, তাঁদের এতকাল একটা বড়ো অবলম্বন ছিল ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত ডেভিড রুবিনের *The World of Premchand*—বইটি প্রেমচন্দ সম্পর্কিত কোনো আলোচনাগ্রন্থ নয়, প্রেমচন্দের তেইশটি গল্পের অনুবাদ। ডেভিড রুবিনের আগেও প্রেমচন্দের গল্প ইংরেজি তর্জমায় গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। ১৯৪৬ সালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক গুরদয়াল মালিক প্রেমচন্দের গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তারপর আরও অনুবাদ বেরিয়েছে এদেশে এবং বিদেশে। ডেভিড রুবিনের অনুবাদ খুবই জনপ্রিয়। ইংরেজি অনুবাদের পাশে বাঙলা অনুবাদের ইতিহাস মনে হয় অধিকতর গৌরবজনক। ১৯৪৫ সালে প্রিয়রঞ্জন সেন অনুবাদ করেন "গোদান"।[৩] সে ই বোধহয় বাঙালি পাঠকের সঙ্গে প্রেমচন্দের উপন্যাসের প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়। তখন প্রিয়রঞ্জন সেনের সেই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পড়ে অধিকাংশ বাঙালি পাঠক ধারণা করেছিলেন যে প্রেমচন্দ গান্ধীবাদী লেখক। গান্ধী আন্দোলন প্রেমচন্দকে প্রভাবিত করেছিল ঠিকই, তবে তখনও 'মহাজনী সভ্যতা'-র কথা বাঙালি পাঠকের জানা ছিল না বলে প্রেমচন্দকে নিটোল গান্ধীবাদী লেখক হিসেবে মেনে নিতে বাঙালি পাঠকসমাজের আপত্তি হয় নি। বাঙলায় রীতি-মতো প্রেমচন্দচর্চা বেড়েছে তাঁর জন্মশতবর্ষের কাছা-কাছি সময়ে অর্থাৎ ১৯৮০ সাল নাগাদ। বাঙালি চলচ্চিত্রপরিচালকের হাতে প্রেমচন্দের খানতিনেক গল্প নিয়ে ফিল্মও হয়ে গেছে—যদিও সেগুলি বাঙলা ভাষায় নয়। তথাপি, যেহেতু পরিচালকেরা সত্যজিৎ রায় (শতরঞ্জ কা খিলাড়ী এবং সদ্‌গতি) এবং মৃণাল সেন (কফন), তার ফলে প্রেমচন্দ নিয়ে বাঙালি বিদগ্ধসমাজে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ বেড়েছে। একটি পত্রিকা যত্নসহকারে একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছিলেন প্রেমচন্দ প্রসঙ্গে, একটি সুসম্পাদিত সংকলন-গ্রন্থও বেরিয়েছিল। বিস্তৃত জীবনী বাঙলায় এখনও বেরোয় নি, সাহিত্য অকাদেমির জীবনীটির বাঙলা অনুবাদ ছাড়া। এই অবস্থায় "কলম কা সিপাহী"র ইংরেজি অনুবাদের সস্তা সংস্করণে অনেক বিদগ্ধ বাঙালি পাঠক কিঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করবেন। তবে ১৯৮২ সালের শক্ত মলাটের সংস্করণ আর ১৯৯১-এর নরম মলাটের দামে ক্রেতা খুব আশ্বস্ত হন না।

প্রেমচন্দের জীবৎকালে তাঁর কোনো প্রামাণ্য জীবনী রচনার উদ্যোগ কেউ নেন নি। ১৯৩৪ সালে, অর্থাৎ প্রেমচন্দ তখনও জীবিত, হিন্দিতে জনার্দন-প্রসাদ ঝা প্রেমচন্দের উপন্যাস নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রেমচন্দের জীবনকথা বা সাহিত্য-কৃতির আলোচনা শুরু হয় মুখ্যত ভারতবর্ষের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ. ডি.-র জন্য রচিত হিন্দি-সাহিত্যবিষয়ক গবেষণাপত্রে আর হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাসূত্রে। অধিকাংশই হিন্দিতে, কিছু ইংরেজিতে। দু-একজন গবেষক বিদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়েও প্রেমচন্দের রচনা নিয়ে গবেষণাপত্র জমা দেন। ১৯৫৭ সালে হংসরাজ রহবার ইংরেজিতে প্রেমচন্দের জীবনী এবং সাহিত্যকৃতি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, যার ভূমিকা লিখে-দিয়েছিলেন বাণারসীদাস চতুর্বেদী। যদিও তার আগের বছরই বেরিয়েছিল প্রেমচন্দ-গৃহিণী শিবরানী দেবীর স্মৃতিকথা "প্রেমচন্দ : ঘর মেঁ"। সেই স্মৃতি-কথাই প্রেমচন্দ-জীবনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান। ১৯৫৯ সালে "প্রেমচন্দ স্মৃতি" নামে তেতাল্লিশ জন বন্ধু এবং সহযোগীর স্মৃতিকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর পর ১৯৬২ সালে অমৃত রায়ের প্রয়াসে এবং সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তিন খণ্ডে প্রেমচন্দের প্রবন্ধ-সংগ্রহ "বিবিধ প্রসঙ্গ" নামে এবং দুই খণ্ডে "চিট্‌ঠিপত্রী", যার প্রথম খণ্ডে মুন্‌শি দয়ানারায়ণ নিগমকে লিখিত ২৮১টি চিঠি এবং পরবর্তী খণ্ডে নানা জনের ২৮৩টি চিঠি সংকলিত হয়। এইসব স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে অমৃত রায় ১৯৬২ সালেই প্রকাশ করেন "প্রেমচন্দ : কলম কা সিপাহী"। এ গ্রন্থের জন্য অমৃত রায় নিজের কাজ দূরে ঠেলে রেখে দিয়ে পাঁচ বছর অনন্য-মনা হয়ে পরিশ্রম করেছেন। কেন তিনি এই পাঁচ বছর নিজের কোনো উপন্যাস রচনায় হাত দেন নি—এ প্রশ্নের জবাবে বলতে চেয়েছিলেন, তিনি তখন যা লিখছিলেন তাও এক উপন্যাস এবং সেই উপন্যাসের নায়কের নাম প্রেমচন্দ। তবে এ উপন্যাসে কল্পনার অবকাশ নেই, কারণ নায়ক যে এক রক্ত-মাংসের ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাই অমৃত রায়ের গ্রন্থটি একটি প্রামাণ্য জীবনী। আরভিং স্টোনের "লাস্ট ফর লাইফ"-এর মতো জীবনীমূলক উপন্যাসধর্মী গ্রন্থ নয়, বা সমরেশ বসুর অসমাপ্ত রচনা "দেখি নাই ফিরে"-র সঙ্গে এ গ্রন্থ তুলনীয় নয়।

অমৃত রায়ের প্রেমচন্দ-জীবনী রচনার প্রস্তুতিপর্ব সবিস্তারে বলা হল। কারণ এ জীবনীটিকে শুধুমাত্র পুত্রের কলমে পিতার আখ্যান মনে করলে ভুল করা হবে। যথার্থ জীবনী রচনার জন্য যে শ্রম ও নিষ্ঠা প্রত্যাশিত অমৃত রায় তা স্বীকার করেছিলেন। এবং তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়েছে গ্রন্থের বিষয় অর্থাৎ প্রেমচন্দের প্রতি জীবনীকারের যথার্থ শ্রদ্ধা, যা জীবনীগ্রন্থ রচনার এক জরুরি শর্ত। এইসব কারণে, এই জীবনীটি জীবনীসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। অমৃত রায়ের 'কলম কা সিপাহী'-র সংক্ষিপ্তসার ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। হরিশ ত্রিবেদী অনুবাদ করেছেন অমৃত রায় অনু-মোদিত সুধা চৌহানের সংক্ষিপ্ত হিন্দি সংস্করণ থেকে। হরিশ ত্রিবেদী এই সংক্ষিপ্ত হিন্দি সংস্করণের তর্জমা করতে গিয়ে কোথাও বর্জন করেছেন, আবার কোথাও মূল হিন্দি গ্রন্থ থেকে খানিক সংযোজনও করেছেন। তার ফলে এটি মূল হিন্দি গ্রন্থ থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এবং যেহেতু প্রুফসংশোধনপর্বে অনু-বাদক অমৃত রায়ের সাহচর্য এবং পরামর্শ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, সে কারণে, অনুবাদে বর্জন বা সংযোজনে মূল লেখকের অনুমোদন আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

যে-মানুষটি নিজের জীবন সম্বন্ধে বিনা ভণিতায় বলেছিলেন যে তাঁর জীবন নিছক সাদামাটা খোলা মাঠের মতো, এ মাঠে খোঁদল-গর্ত আছে, কিন্তু কেউ যদি এখানে পাহাড় পর্বত, গহিন বন, উপত্যকা বা নয়নশোভন ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে আসেন, তিনি নিতান্তই হতাশ হবেন, তাঁর জীবনকথা নিয়ে অমৃত রায় সাহস করে সাড়ে ছ শ পৃষ্ঠার উপর এক বই লিখেছিলেন, যা শুধু প্রামাণ্য জীবনী হিসেবে নয়, এক সার্থক সাহিত্যগ্রন্থ হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ অমৃত রায় এই নিতান্ত 'সাধারণ' মানুষটিকে সমসাময়িক দেশ সমাজ এবং কালের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রেমচন্দের জন্ম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে। ১৮৯৭ সালে প্লেগ মহামারী নিয়ে যখন ভারতের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত পশ্চিমভারতে এক-দিকে সেবা এবং অপরদিকে মহামারীর সূত্রে সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ক্রোধ সঞ্চিত হচ্ছে, তখন প্রেমচন্দ সতেরো বছরের যুবক। ১৯০৫ সালে যখন বাঙলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এল, তার দু বছর বাদে প্রেমচন্দের প্রথম ছোটোগল্প "দুনিয়া কা সবসে অনমোল রতন"-এ লিখলেন, 'দেশের মুক্তির জন্য প্রদত্ত শরীরের শেষ রক্তবিন্দুই দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান মুক্তো।' ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর সরকারি চাকুরিয়া হয়েও ঘরে ক্ষুদিরামের একটি ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন। এক বছর বাদে তাঁর গল্পসংকলন "সোজে ওয়াতন"-এর জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবাবদিহি করতে এবং সাতশো কপি বই সাহেবের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। ১৯২১ সালে গোরখপুরে গান্ধীজির ভাষণ শুনে তার সাতদিনের মধ্যে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন। পত্রিকা চালান, ছাপাখানা পরিচালনা করেন। অর্থের প্রয়োজনে বোম্বাইয়ে ফিল্ম কোম্পানির জন্য কাজ করতেও বাধ্য হন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতি হন। লেখেন "মহাজনী সভ্যতা"র মতো প্রবন্ধ। কংগ্রেসের জন্ম থেকে প্রগতি লেখক সম্মেলন প্রতিষ্ঠা—এরই সমসাময়িক ছিলেন প্রেমচন্দ। এবং লামহি গ্রামের এই মানুষটি, সাত-আট বছরে মাকে হারিয়েছিলেন, সতেরো বছর বয়সে পিতা, পোস্টাফিসের কেরানি, মারা যান, ফলে সে বছর তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া হয় না—এইখান থেকে তাঁর জীবনসংগ্রাম শুরু। তারপর থেকে দেশের যে-কোনো ঘটনাতেই তিনি প্রভাবিত হয়েছেন, প্রয়োজনে প্রতিবাদ করেছেন, কলম ধরেছেন, স্ত্রী কারাবরণ করেছেন। কিন্তু নিজেকে জাহির করেন নি কখনও। লেখা পড়ে, নাম শুনে যাঁরা দেখা করতে এসেছেন, স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন, তাঁরা এই আত্মগোপনশীল মানুষটিকে চিনতেই পারেন নি। সেই প্রেমচন্দের জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় নিশ্চয়ই তাঁর সাহিত্য, কিন্তু তাঁর জীবনীও যে সাহিত্যের উপাদান, তার প্রমাণ দিয়েছেন অমৃত রায়।

অমৃত রায় তাঁর উপাদানকে নিপুণভাবে ব্যবহার করে একটি আদর্শ জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন হিন্দিতে। এই কৃতিত্বের সিংহভাগ নিশ্চয়ই অমৃত রায়ের প্রাপ্য। হরিশ ত্রিবেদী যখন সেই গ্রন্থ ইংরেজিতে তর্জমার দায়িত্ব নেন, তখন স্বভাবতই অমৃত রায়ের ভাষা-বৈভব কেমন করে অক্ষুণ্ণ রাখবেন সে কথা ভাবেন। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদের পাঠক শেষ পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলবেন। হরিশ ত্রিবেদী তাঁর প্রয়াসে অনেকটাই সাফল্য অর্জন করেছেন। ইংরেজি অনুবাদে মূল হিন্দির আবেগ এবং সজীবতা অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে হরিশ ত্রিবেদীর অনুবাদও অন্যান্য ভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদকদের সাহায্য করবে। তবে পরিশেষে প্রকাশকের কাছে একটি ছোটো নিবেদন। ১৯৮২-সংস্করণে একটি মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য ভূমিকায় অনুবাদক বিশেষভাবে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৯১ সালে ছাপা পেপারব্যাক সংস্করণে সেই মুদ্রণ-প্রমাদটি সংশোধন না করে অনুবাদকের সেই কুণ্ঠাটুকুই জিইয়ে রাখা হল, বোধহয় হুবহু প্রতিলিপি ছাপার আধুনিক পদ্ধতিতে প্রকাশক নিরুপায়। ওই প্রমাদটুকু (১৯২৩ স্থলে ১৯৩২ হবে) সংশোধন করতে গেলে মাত্র একটি পৃষ্ঠা নতুন করে কম্পোজ করতে হত এবং অপর একটি পৃষ্ঠায় (২৭৭ পৃষ্ঠা) একটি মুদ্রিত সালের উপর সংশোধিত সালটি বসিয়ে প্রতিলিপি নিলেই ব্যাপারটা সামলানো যেত। অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস এটুকু পরিশ্রম স্বীকারেও কাতর

হলেন!

১. হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস, রামবহাল তেওয়ারী। বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

২. হিন্দীভাষীদের উচ্চারণে 'অমৃৎ রায়', 'অম্‌ৃৎ রায়' নয়। পিতার নাম ধনপৎ রায়, অগ্রজের নাম শ্রীপৎ, সে বিচারে 'অমৃৎ'-ই সঠিক উচ্চারণ। তবে বাঙালি পাঠকের চোখে অস্বস্তিকর ঠেকবে বলে 'অমৃত' লেখা হল।

৩. প্রেমচন্দ ১৯১৯ সালে মুন্‌শি দয়ানারায়ণকে লিখছেন, 'আমার গল্প বাংলায় তর্জমা হয়েছে।' যদি সে তর্জমা ছাপা হয়ে থাকে, তাহলে তার সূত্রেই বাঙালি পাঠকের প্রথম প্রেমচন্দ-পরিচয়। শ্রীসুধী প্রধান "পরিচয়" পত্রিকায় প্রেমচন্দ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯৪৬ সালে।

বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস কি কেবল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে?

গৌতম ভদ্র

আলোচনা গৌতম নিয়োগীর "ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা" এবং সুরজিৎ দাশগুপ্তের "ভারতবর্ষ ও ইসলাম"—বই দুটি নিয়ে। লেখকরা সবাই অসাম্প্রদায়িক। ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে তাঁরা লিখেছেন। গৌতমবাবু 'গোঁড়ামিমুক্ত উদার অসাম্প্রদায়িক সার্বিক ভ্রাতৃত্ব-বোধের প্রতি অনুরাগী' এবং তার জোরেই তিনি ইতিহাসপাঠে সাম্প্রদায়িকতার রকমফের দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে সুরজিৎবাবুও মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন ভেবেই বইটি লিখেছেন। ইতিহাসরচনায় উভয়েই সত্যসাধক, বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসরচনায় উভয়েরই আগ্রহ আছে। কোনো বইয়েরই উদ্দিষ্ট পাঠক বিশেষজ্ঞ নন, বরং সাধারণ পাঠক।

গৌতমবাবুর বইটি টুকরো-টুকরো লেখার সংকলন। বইতে ইরফান হাবিব এবং গৌরকিশোর ঘোষ প্রদত্ত দুইটি সাক্ষাৎকার আছে। "রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ" নিয়ে যে ইতিহাসবিরোধী বিতর্ক চলছে, সেইটা নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। ভিন্ন-ভিন্ন পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য বই নিয়ে ইতিহাস-রচনায় সাম্প্রদায়িকতা কীভাবে গেড়ে বসে বা বসে না, সেই বিষয়ে গৌতমবাবু নানা টুকরো লেখায় পর্যালোচনা করেছেন। সবশেষে, একটি বারো পৃষ্ঠার সহায়ক রচনাপঞ্জি দেওয়া হয়েছে। আয়োজনের কোনোই ত্রুটি নেই।

ইসলামের প্রথম যোগাযোগ এবং আগমন থেকে আধুনিক বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিরাট সময়-কাল সুরজিৎবাবুর আলোচনার বিষয়। এই বইয়ের আলোচনার জোর পড়েছে অষ্টম থেকে দশম শতকের মধ্যে ভারত ও ইসলামের যোগাযোগের ওপর। ইসলামের অনুপ্রবেশজনিত প্রতিক্রিয়ার জন্য স্থানীয় বা দেশজ ধর্মমত একত্রিত হয়ে হিন্দুধর্মের আধারে পরিণতি লাভ করল—এই বক্তব্য একটি চিত্তাকর্ষক সিদ্ধান্ত। এবং ধাপে-ধাপে কীভাবে ইসলাম ভারতীয় সংস্কৃতিতে ক্রিয়াশীল হল, কী পরিস্থিতিতে দেশভাগ হল, লেখক গল্পটা আপাতত সেইখানে থামিয়ে দিয়েছেন।

বই দুইটি সুলিখিত। লেখকরাও তাঁদের বিশ্বাসে স্থির। বই দুইটিকে ঘিরে খুচরো তথ্যের প্রশ্ন তোলা বা জটিল তর্ক তুলে ধরার সুযোগ কম। সরলভাবে সব কথা বলা হয়েছে, জানা তথ্য পেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই বই দুইটি একটি বিশেষ চিন্তার পরিবাহী, লেখকরা এক বিশেষ মানসিক জগতের অধিবাসী। খুচরো ব্যতিক্রম ছাড়া সেই জগৎ বড়ো

ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা—গৌতম নিয়োগী। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯। পঞ্চাশ টাকা।

ভারতবর্ষ ও ইসলাম—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা-৭০০ ০০৬। আশি টাকা।

সুখের জগৎ। হিন্দু এবং মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবিই বড়ো করে দেখাতে হবে, কারণ সেইটি সত্য, সেইটার পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে। ইংরাজ শাসক এবং কিছু কুচক্রী রাজনীতিবিদরা সব গোলমাল করে করে দেয় ভোটের খেলায়, স্বার্থের ঝোঁকে অন্ধদের কুপথে পরিচালিত করে। ফলে, "সেকুলার রাষ্ট্রের" বিপদ হয়। 'নাগরিক মন' বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এই সাদা আর কালোর লড়াইয়ে রাম এবং রাবণের যুদ্ধে সহানুভূতি কার পক্ষে থাকবে, তাও তো পূর্বনির্দিষ্ট। আমাদের উদ্দেশ্য জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক তৈরি করা, নির্দিষ্ট আর বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণের সাহায্যে ইতিহাসের সত্য তুলে ধরা—যে সত্য দলিল-দস্তাবেজ খুঁটে-খুঁটে পাওয়া যায়। ফলে, ছুয়েকটা আলটপকা মন্তব্যে আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ফলে সহজেই বলা যেতে পারে 'ঔরঙ্গজেবের ঘোর **অদূরদর্শিতাই** মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম এবং প্রধান কারণ' (দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৭৩) বা নানা অন্তসূত্র থাকার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে 'সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে এই সরল এবং সুদৃঢ় একেশ্বরবাদ শঙ্করাচার্য ইসলাম ধর্ম থেকেই পেয়েছিলেন' (দাশগুপ্ত ১১৯) [নজরটান বর্তমান সমালোচকের]।

গৌতম নিয়োগী নিঃসংশয়ে বলে দেন, 'ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ, যাঁরা আধুনিক যুগের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন, তাঁরা এবং সরকারী আমলা ও প্রশাসক **সবাই** ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন।' (পৃ. ৫০) [নজরটান বর্তমান সমালোচকের] এবং গৌতমবাবু আরো বলে দেন যে কী করতে হবে।

একমাত্র আমরা জানি যে ইতিহাস কথাটির **প্রকৃত ব্যঞ্জনা আর মাহাত্ম্য** প্রায় সর্বাংশে লোপ পায় যদি না শব্দটির আগে **'সচেতনভাবে বিজ্ঞান-সম্মত'** এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথা দুটি সযত্নে জুড়ে দিই। অনেকে এই কথা যদি মানতে না চান, তবে বুঝবেন অনেক কারণ; যার অন্যতম ধর্মীয় গোঁড়ামি জাত দৃষ্টিহীনতা'। [পৃ. ১২] [নজরটান বর্তমান সমালোচকের।]

আমার স্বভাবটাই খারাপ। এইরকম পংক্তি পড়লেই মনটা আঁতকে ওঠে। একই বাক্যে যুক্তি, সিদ্ধান্ত আর লেবেল মেরে দেওয়া—সবই সেরে ফেলা হল। এই বাক্যের মেজাজের সঙ্গে কোনো হিদায়েতি ফতোয়ার বা মালকানি অথবা গুরু গোল-ওয়ালকারের কোনো বাণীর মেজাজের তফাত খুঁজে পাওয়া ভার। শব্দে পার্থক্য থাকতেই পারে।

আগেই বলেছি, সেই সময়টা বড়ো সুখের ছিল, যখন জাতীয় রাষ্ট্র তৈরি হবার স্বপ্নে আমরা সবাই বিভোর ছিলাম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলাম 'যুক্তিবাদ', 'বিজ্ঞানবাদ' আর 'ইতিহাসবোধ', তাতে সুবিধা হত প্রচুর। মনে কোনো সন্দেহ থাকত না, সব কিছুই খোপে-খোপে ভরে ব্যাখ্যা করতে পারতাম, টকটক করে বুঝে যেতাম কে শত্রু, কেই বা মিত্র, 'সাধারণ' লোকদেরও সেই অনুযায়ী বোঝাতে পারতাম। কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে নানা ধূসর জায়গা থাকতে পারে, সেটার কথা খেয়াল থাকত না। মনে থাকত না যে সুফীদের সিলসিলার রকমফের বা শেষ নেই, 'বশরা' এবং 'বেশরা' সুফীরা মতবাদে এবং জীবনচর্চায় দুই মেরুতে বাস করেন। হিন্দু আর মুসলিম ঐক্যের ঐতিহ্য খুঁজে বার করার তাগিদে বুঝতাম না যে নানা কবির আছেন নিছক সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রবক্তার মাত্রায় ধরা পড়ে, বিষ্ণুক্ত এবং অশান্ত কবির হারিয়ে গেছেন। মেনে নিতে পারতাম না যে রবীন্দ্রনাথ বা ক্ষিতিমোহন সেন তাঁদের অনুবাদে যে আত্মসমাহিত কবিরকে ধরার চেষ্টা করেছেন, তা তাঁদেরই প্রকল্পের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানের পরে তো কথা নেই, নাগরিক হিসাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করার দায়ে তো আমাদেরই, আর গৌতমবাবু

তো বলেই দিয়েছেন যে সচেতনভাবে 'বিজ্ঞানসম্মত' আর 'ধর্মনিরপেক্ষ' ইতিহাস লেখার আদিকল্পের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেই তো বুঝতে হবে অন্য মতলব আছে। অতএব এখানেই থামা যাক।

সৃজনশীল শিল্পীর মুখে নাট্যতত্ত্বের আলোচনা

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

তত্ত্বের কাজ শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ এবং তার একটি যুক্তিনির্ভর কাঠামো সৃষ্টি করা। কিন্তু, দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার মতো তত্ত্বকে স্থান দেয়া হয় শিল্পের আগে। তত্ত্বকে এই বাড়াবাড়ি রকমের গুরুত্ব দেবার চল আছে পণ্ডিত মহলে। তত্ত্বের মাহাত্ম্যকীর্তনে ব্যস্ত তাত্ত্বিকরা শিল্পের জটিল পদ্ধতিকে সরল করে বোঝার বদলে তাকে করে তোলেন আরো ঘোলাটে, আর দুর্বোধ্য এবং ভুলে যান যে শিল্পকর্ম আদতে একটি সৃষ্টি যার সবটাই ব্যাখ্যাত হতে পারে না। ফলে, তত্ত্বের আলোচনায় প্রায়শই শিল্পের সঙ্গে সহজ পরিচয়ের পরিবর্তে গড়ে ওঠে খানিক সন্ত্রস্ত এক দূরত্ব।

কিন্তু, একজন শিল্পী যখন নিজেই শিল্পের তত্ত্বগত দিকটি সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করেন তখন এইজাতীয় বিড়ম্বনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, শিল্পী হিসেবে সৃষ্টিকে তিনি জেনেছেন তার ভেতর দিক থেকে, বুঝেছেন তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে, নির্লিপ্ত পণ্ডিতের শুকনো ব্যবচ্ছেদপ্রবণতা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। শিল্পীর মুখ থেকে শিল্পতত্ত্বের আলোচনা শোনবার সৌভাগ্য সাধারণত ঘটে না, যেহেতু শিল্পীর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম তাঁর শিল্প। তাঁর সমস্ত মনন ও প্রতিভা কেন্দ্রীভূত হয় শিল্পসৃষ্টিতে। কিন্তু, কখনও-কখনও এমন শুভ যোগাযোগ ঘটে যখন শিল্পী নিজেই তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এবং তিনি যদি হনভারতীয় নাট্যের প্রবাদপুরুষ শম্ভু মিত্র, নাট্যালোচনায় যিনি ইতিপূর্বেই বাঙলার নাট্যপ্রেমীদের উপহার দিয়েছেন "প্রসঙ্গ : নাট্য" বা "সম্মার্গ সপর্যা"—যে দুটি গ্রন্থের স্বচ্ছ, সাবলীল বিশ্লেষণ নাট্যের অন্তর্নিহিত স্বভাবকে তীক্ষ্ণ ধীশক্তির স্বচ্ছ আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে, তবে তো সে সুযোগ যথার্থই দুর্লভ। এমনই এক সংযোগ ঘটেছিল ১৯৮৮-র ১৬ই জুন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায়। যেসব নাট্যামোদী "জলসা-ঘর বক্তৃতামালা"-র অন্তর্গত সেই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি তাঁদের জন্য আনন্দ পাবলিশার্স সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন এর একটি লিখিত রূপ—"কাকে বলে নাট্যকলা", আগ্রহীদের কাছে যা এক পরম প্রাপ্তি।

আলাপচারি ঢঙে মুখে-বলা কথাগুলি ক্যাসেট থেকে লিপিবদ্ধ হবার ফলে এ রচনায় মৌখিক ভাষার সহজ, সচ্ছন্দ চলটি বজায় থেকেছে। সাধারণত এজাতীয় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসের যে ভার পদে-পদে বাধা সৃষ্টি করে এখানে তা একেবারেই অনুপস্থিত। অথচ, আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়টি অত্যন্ত জটিল—নাট্যকলা, সবরকম শিল্পের মধ্যে যার সৃষ্টিপদ্ধতিটি অনুধাবন বোধ হয় সবচেয়ে দুরূহ। নাট্যের মধ্যে ঘটে নানা শিল্পকলার মেল-বন্ধন, নাট্যকে তাই বলা হয় তিলোত্তমা শিল্প। কিন্তু, এই তিলোত্তমার সামগ্রিক রূপটি কী, কী সেই রূপের অন্তর্নিহিত রহস্য, সেটিই উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন শ্রীমিত্র তাঁর পর্যালোচনায়। শ্রোতা/পাঠককে বিষয়ের গভীরে নিয়ে যাওয়ার একটি বিশেষ রীতি আছে শ্রীমিত্রের—যেটাকে বলা যেতে

নাট্যকলা কাকে বলে—শম্ভু মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। পনেরো টাকা।

পারে খানিকটা সোক্রাটিক পদ্ধতি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন গেঁথে তুলে তিনি যেন বিষয়টির অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় দিকগুলিকে অতিক্রম করতে-করতে বা বলা যেতে পারে ছাঁটতে-ছাঁটতে ক্রমশ কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে তিনি একটি যুক্তি উত্থাপন করার সঙ্গে-সঙ্গে বিপরীত যুক্তিটিকেও তুলে ধরেন, অবশেষে পাল্লা মেপে সিদ্ধান্তে পৌঁছন। উদাহরণ হিসেবে উদ্‌ধৃত হতে পারে একটি অংশ :

'…আমরা আলোচনা করতে চাইছি সেই নাট্যের যেখানে নাটককারের যে কৃতি এবং নটনটীদের যে কৃতি উভয়ে মিলে আমাদের একটি গভীর উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায়। এবং সেই যে নাট্য তার মধ্যে এই নাটকটা একটা অংশ।

'কিন্তু এই কথাটা যখন বলা তখনই আমাদের মনে হয় যে, তাহলে সোফোক্লেস, কি শেক্সপীয়র, কি রবীন্দ্রনাথ—এঁরা কি কেবল নাট্যকলার অংশী?… তাহলে তাঁরা কি আসল স্রষ্টা নন।…কিন্তু উলটো দিক দিয়ে যদি ভাবা যায় যে নাটককারই যদি মূল কলাস্রষ্টা হন তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে তো যে নাটক লেখাতেই নাট্যকলা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারপরে অভিনয়টা হোক বা না হোক সেটা গৌণ। তাহলে আমরা নাট্যকলা বলে একটা আলাদা নাম সৃষ্টি করছি কেন?…'

আর্থার কোয়েসলার লিখেছেন যে কোনো শিল্প-কৃতি সৃষ্টির মধ্যে নিহিত থাকে অনেকগুলি প্রক্রিয়ার ক্রমপর্যায়, যার সবগুলিই প্রকৃতপক্ষে একই সময়ে ঘটতে থাকে এবং তা কখনোই কথায় প্রকাশ করা যায় না, করতে গেলে তা বিকৃত, অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। আমরা এখন দেখব এক স্রষ্টা-শিল্পী কেমন অনায়াসে কোনো লিখিত-পাঠের সহায়তা ছাড়াই মুখে-মুখে ব্যাখ্যা করেছেন এমন একটি শিল্পকলার অন্তর্নিহিত রহস্য—যার আয়ু শুধুমাত্র সৃষ্টির কালটুকু জুড়ে, সেই কাল ফুরোলে যে সৃষ্টিটিও চিরদিনের মতো ফুরোয়।

নাট্যশিল্পের জন্য দরকার বিস্তর আয়োজন—নাটক চাই, অভিনেতা চাই, গাইয়ে বা বাজিয়ে চাই, আলো চাই, মঞ্চ সাজাতে হয়। কত জনের কত সৃজনশীল চেষ্টায় গড়ে ওঠে নাট্য। আর, তাতেই বাধে গণ্ডগোল। এতজনের মধ্যে স্রষ্টা কোন্‌জন? যে কালে নাট্যকলাকে একটি সম্মিলিত শিল্প বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি আমরা অনেকেই সেকালে এই প্রশ্নটি থেকেই তো শুরু হওয়া উচিত নাট্যকলা সম্বন্ধীয় আলোচনা। কিন্তু, 'উচিত' যে সেটা তো আলোচনাটি শ্রীমিত্র এইভাবে শুরু করাতে মনে হল। না হলে, নাট্যকলা অভিনেতার না নির্দেশকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাকি সংশ্লিষ্ট সকলের এজমালি সম্পত্তি অর্থাৎ সম্মিলিত শিল্প এমনধারার নানা বিরোধী মতাবলম্বী শিবিরে বিভক্ত থেকে বেশ কেটে যাচ্ছিল আমাদের নাট্যালোচনার অবকাশ। শ্রীমিত্র প্রশ্ন তুললেন যে, আধুনিক গানের ক্ষেত্রে যেখানে গীতিকার, সুরকার, গায়ক—এই তিন ভূমিকায় তিনজন শিল্পী যুক্ত হয়ে থাকেন, বা চলচ্চিত্রে নির্দেশক এবং অভিনেতা ছাড়া আরও নানাবিধ শিল্পী ও কলাকুশলী জড়িত থাকেন—সেসব ক্ষেত্রে 'স্রষ্টা কে?' এই প্রশ্নটির নিষ্পত্তির জন্য কি বলে দিলেই চলবে যে আধুনিক গান বা চলচ্চিত্র 'সংযুক্ত শিল্প'। এই প্রশ্নগুলি তুলে দিয়েই কিন্তু তিনি বলে দেন, 'প্রত্যেক কলাশিল্পের একটা গঠনগত সম্পূর্ণতা থাকে' যা দিয়ে সেই কলাটির বিশিষ্টতা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। খানিক পরেই আবার ব্যাখ্যা করে বলেন, '… প্রত্যেক কলাশিল্পের প্রকাশের একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, অন্য কোনো কলাশিল্পের দ্বারা তা প্রকাশ করা যায় না।…' উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন যে গান বা বাজনা শোনার সময় আমাদের মনের ভেতর যে অনুভব সৃষ্টি হয় সেটা কখনোই লিখে বা এঁকে বা নেচে বোঝানো যায় না। নাট্যাভিনয়ের বেলাতেও তাই। নাট্য তাই একটি স্বতন্ত্র কলা। কিন্তু, এই নাট্যকলার স্রষ্টা কে? '…ইউরোপে একসময়ে একটা অভিনেতা-কেন্দ্রিক নাট্যরীতির প্রচলন হয়েছিল। যেখানে নাটককারের কোনো দরকারই ছিল না।…' কিন্তু সেটা বেশিদিন টেঁকে নি। আবার উলটো দিকে, নাট্যাভিনয় দিকটি সম্পর্কে তেমন তোয়াক্কা না করে কেউ-কেউ নাটক লিখেছেন, সেগুলিও টেঁকে নি। তারপরে ইঙ্গিত করেছেন সম্ভবত ক্রেগ বা তাঁর অনুসারীদের প্রতি যাঁরা মনে করতেন নির্দেশকই স্রষ্টা, অভিনেতারা তাঁদের হাতের পুতুল মাত্র এবং সেইজাতীয় নাট্যপ্রচেষ্টাও বাঁচে নি। নাট্যের নানা রকমভেদ স্বীকার করে নিয়ে শ্রীমিত্র স্পষ্ট করে দেন যে তাঁর আগ্রহ একমাত্র নাটককে আশ্রয় করে গড়ে-ওঠা গভীর উপলব্ধির নাট্যে। কিন্তু, নাটককে আশ্রয় করেই যদি নাট্য গড়ে ওঠে তাহলে কি অভিনয় হোক বা না হোক নাটক লিখলেই নাট্যসৃষ্টি হয়ে যায়! নাটককারই কি তাহলে নাট্যকার! অথচ, একথা আমাদের মানতে বাধে—আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। আর, সেই কথাটিও লেখকই বলে দেন। নাটকে যেটুকু লেখা সেটাকে যে 'ছাড়িয়ে চলে যায়' অভিনয়, এ তো আমরা দেখেছি—তাঁর অভিনয়ের বেলাতেই দেখেছি। শ্রীমিত্র অবশ্য তাঁর দেখা অভিনয়ের উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন সেই কথা। আর, তা করতে গিয়েই তুলে ফেলেন প্রত্যেক শিল্পের প্রকাশের নিজস্বতার প্রসঙ্গ, যা কখনোই অন্য কোনো শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু, তাহলে নাট্যকলা সৃষ্টি হচ্ছে কখন? শুধু অভিনয়কালে? নাট্যকলায় মঞ্চসজ্জা আছে, নেপথ্য সঙ্গীত আছে, থাকতে পারে নৃত্যকলার ব্যবহার, আলোকপাতশিল্পেরও সহভাগ থাকে নাট্যে। তিনি বলেন যে তিল-তিল করে রূপ আহরণ করা হলেও তিলোত্তমা একটাই প্রাণী। তার নাকটা, কি চোখটা, কি ঠোঁটটা, কি বুকটা, কি হাতটার কোনো আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। সেগুলো সবই তিলোত্তমার মধ্যে, তিলোত্তমারই অংশ। খানিক পরেই বুঝিয়ে বলেন যে চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা এক-একটি আলাদা-আলাদা শিল্পকলা, কিন্তু নাট্যে যখন ব্যবহৃত হয় তখন তাদের সেই স্বাধীনতা থাকে না। নাট্যকলায় যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই ব্যবহৃত হয়।

ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক অশোক কেলকার-এর 'নাট্যকৃতি এক হয়ে-ওঠা' (Play is the Thing) নিবন্ধটিতে শ্রীমিত্রের উপরি-উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়, '…নাট্য একটি মিশ্র শিল্প—এই বহুবার-শোনা কথাটার চল কী করে হল তা বোঝা যায়, কিন্তু যা বোঝা মুশকিল তা হল এই অতি-প্রচলিত ধারণাটার যথার্থতা কী করে প্রমাণ করা যাবে। মিশ্র শিল্প-আঙ্গিক বলে কিছু হয় না, কেননা কোনো শিল্পকর্ম কখনোই কতগুলি জিনিসের পাঁচ-মিশেল হতে পারে না।…একটা শিল্প আরেকটা শিল্পের মধ্যে উপাদান হিসেবে এসে পড়তে পারে, যেমন নৃত্যের মধ্যে সংগীত আসে বাহক-উপাদান হিসেবে কিংবা ছবি-আঁকার মধ্যে নৃত্য যেমন এসে পড়ে (দেগার কিছু-কিছু কাজে যেমন) আধেয়-উপাদান হিসেবে।… তাহলে, নৃত্যনাট্য আসলে নাট্যিক নৃত্য; সংগীত-নাট্য আসলে নাট্যিক সংগীত…'।

তাহলে, তিল-তিল করে গড়ে তোলা তিলোত্তমার মধ্যে অর্থাৎ নাট্যে চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা, নৃত্যকলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে বলে বলা যাবে না যে এগুলো নাট্যাভিনয়ের অঙ্গ। শ্রীমিত্র বলেন যে, অঙ্গ তো নয়ই—সম্ভবত সেগুলিকে অংশও বলা যায় না। কেননা, দৃশ্যসজ্জা ছাড়াও নাট্য হতে পারে, সেক্ষেত্রে চিত্রকরের প্রয়োজন পড়ে না। সঙ্গীতেরও কোনো প্রয়োজন না থাকতে পারে কোনো নাট্যকর্মে। তাহলে, বাকি থাকে কী? '…খালি নাটক আর অভিনয়।…' আমরা আগেই বলেছি আলোচ্য গ্রন্থে এই কথাটি লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন—যে নাট্যে নাটককার এবং নটনটীদের কৃতি যুগ্মভাবে আমাদের পরিচালিত করে গভীর উপলব্ধির দিকে, তিনি সেই নাট্যের আলোচনাতেই আগ্রহী। তাই, নাটক আর অভিনয় তাঁর মতে সব

সময়ে আলাদা করে দেখবারও নয়। কারণ, নাটক অভিনয়ের জন্যই লেখা। ঠিক যেমন সিনারিও বা শুটিং স্ক্রিপ্ট লেখা হয় চলচ্চিত্রের জন্য। সেগুলো যেমন সম্পূর্ণ হয় চলচ্চিত্রে, নাটকও তেমনি সম্পূর্ণ হয় মঞ্চাভিনয়ে। আর তাই, নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নাটক শুধুমাত্র একটা অংশ—সম্পূর্ণ সৃষ্টি নয়। অভিনয়ও ঠিক তেমনি আর-একটি অংশ, নাটকের সঙ্গে যুক্ত হলে তবে তা সম্পূর্ণ হয়। পিটার ব্রুক—যিনি একসময় মনে করেছিলেন যে, যে-কোনো একটি নিরাভরণ পরিসরই একটি শূন্য মঞ্চ, সেই নিরাভরণ পরিসরে একটি মানুষ হেঁটে চলেছে আর অন্য একজন তাকে লক্ষ করছে—ব্যস, নাট্যকলায় মঞ্চবার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট, তিনি সম্প্রতি একটু অন্যভাবে হলেও শ্রীমিত্রের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, '...(অভিনয়কালে সংলাপের) একটি শব্দ এবং তার পরবর্তীটির মধ্যে যা ঘটে তা এতই সূক্ষ্ম যে নিশ্চিত করে বলা বড়োই মুশকিল যে তার কতখানি নাটককারের আর কতখানিই বা অভিনেতার সৃষ্টি।...' পরস্পর-সম্পূরক নাটক আর অভিনয় মূলত এই দুইকে আশ্রয় করে তাহলে গড়ে ওঠে নাট্যকলা—অর্থাৎ, নাটককার এবং নটনটী মিলে সৃষ্টি করেন নাট্য। আমাদের মনে পড়ে ড. কেলকার-এর মতে নাট্যে স্রষ্টার ভূমিকা চারজনের: (১) নাটককার, (২) নির্দেশক—যিনি মঞ্চায়ন-পাঠটি তৈরি করেন, (৩) নট—যিনি মঞ্চায়ন করেন এবং (৪) গ্রহীতা (অর্থাৎ দর্শক)—যিনি আবার অভিনয় দেখতে-দেখতেই মনে-মনে মঞ্চায়ন করেন। ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, প্রথম তিনটি ভূমিকার মধ্যে আদতে নাটক আর অভিনয়ের যুগ্মকৃতিরই নির্দেশ রয়েছে। আর, গ্রহীতাকে স্রষ্টার ভূমিকায় বসিয়ে সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অনাহক মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রসারিত করা হয়েছে। দর্শকের মানস-মঞ্চায়ন তথা পুনঃসৃজন তো চলতে থাকে অভিনয় দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই। তবুও, তাকে স্রষ্টার ভূমিকার অংশভাগ বা পুনঃস্রষ্টার আসনটি দিতে চেয়ে ড. কেলকার এক-ধরনের জটিলতা তৈরি করে ফেলেন। অথচ, নাট্য-কলায় দর্শকের যে গ্রহীতা-সহভাগীর ভূমিকা এই সত্যটি একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণে অনায়াসে প্রমাণ হয়ে যায় শ্রীমিত্রের ভাষণদানকালে, আর সেই সুযোগে তিনি স্পষ্ট করে দেন দর্শকের ভূমিকাটিকে, '...ধরা যাক যে একটা অভিনয় হচ্ছে। অভিনয়ের মধ্যে একজন লোক বলল,—'দেখো সূর্যাস্তটা কি সুন্দর লাল হয়েছে'। তাতে অপর লোকটি—যাকে বলল—সে তাচ্ছিল্য করে না তাকিয়ে বলল, —'এরকম রোজই হয়'। (শ্রোতাদের উচ্চহাস্য)—এই যে বলতেই আপনারা যেমন হেসে উঠলেন, জানবেন এই দৃশ্যে সকলেই ঠিক এইরকমভাবে হেসে উঠবেই। কেন হেসে ওঠে? —লোকে হাসে এইজন্য যে প্রথম ব্যক্তিটি যখন সূর্যাস্তের কথা বলছিল তখন তার প্রত্যাশা ছিল যে অপর লোকটি খানিকটা অন্তত সায় দেবে। তা সে যখন দিলে না, তখন বড়ো অপ্রস্তুত বোধ করল, এবং সে অপ্রস্তুত বোধ করল বলেই লোকেরা হেসে উঠল। লক্ষ করবেন যে সে অপ্রস্তুত হবার পরে অপ্রস্তুতের ভাব প্রকাশ করল, তারপর লোকে হাসল, তা কিন্তু হয় না। দ্বিতীয় লোকটি যেমনি বলবে—ওরকম রোজই হয়,—অমনি দর্শক হাসবে। কারণ দর্শক নিজে ভেতরে-ভেতরে বুঝে নিয়েছিল যে ওর প্রত্যাশাটা হচ্ছে অন্য জনও ওর কথাতে সায় দেবে। এবং দেয় নি বলে প্রথম ব্যক্তিটি যে বিব্রত হবে, অপ্রস্তুত হবে, সেটা দর্শক সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারে বলে তখনই হেসে ওঠে।...' নাট্যকলার স্রষ্টা তাহলে নাটককার এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন বাইনারি স্টার বা যুগ্মতারার—সমান ওজনের দুটি তারা যারা অনবরত পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে।

নাটকে যা লিখিত থাকে এবং অভিনয়কালে অভিনেতা যা বলেন—এই দুয়ের মধ্যে যে একটা ভাষাগত ব্যবধান ঘটে, কীভাবে তা ঘটে এবং কেন যে তা ঘটানো প্রয়োজন—এসব সম্বন্ধে এমনকি অনেক নাট্যকর্মীরও খুব একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে না। লেখক আমাদের খেয়াল করিয়ে দেন যে আমরা যেভাবে নিজেরা কথা বলি সেভাবে কখনো লিখি না, আবার যেভাবে লিখি, পড়ার সময় ঠিক সেভাবে পড়িও না। কারণ, লেখা এবং কথা উভয় ভাষাই তার আপন-আপন নিয়ম (বা অনিয়ম) মেনে চলে। ফলে, অভিনয়ের সময় নাটকের কথা-গুলোকে জীবন্ত করে তোলার প্রয়োজন হয়। এসব কথা নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন তাঁরা জানেন যে আমাদের কথা বলার ধরনগুলি আসলে যে পরিবেশে আমরা বেড়ে উঠি সেখানকার প্রচলিত বাকরীতির অসচেতন (কিংবা কখনো-সখনো সচেতন) অনুকরণে গড়ে ওঠে। প্রতিদিন আমরা যে কথাগুলি শুনি তার আওয়াজের স্তর ও নান্দনিক চরিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বা তার অভাব, আবহাওয়ার তাপমাত্রা—শুষ্কতা বা আর্দ্রতা, আমাদের অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনের কিংবা নিজেদেরই জীবিকা, কী ধরনের শিক্ষা আমরা পাই আর আমাদের চালচলনই বা কতখানি সেই শিক্ষানুযায়ী, আমাদের সামাজিক জীবন ইত্যাদি অর্থাৎ এক কথায় আমাদের গোটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই আমাদের কথা বলার ধরন-ধারন গড়ে দেয়। এইরকম স্বাভাবিকভাবে আয়ত্ত হয়ে-যাওয়া কথা-বলার ধরন গড়ে উঠতে-থাকা ব্যক্তিত্বের ধরনের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এক-একটা নিজস্বতার ছক তৈরি হয় যার মধ্য দিয়ে, কথা বলার সময়, আমাদের চরিত্র খুবই তাৎপর্যপূর্ণ-ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কথা বলার সময় মানুষ তার নিজের পরিবেশ আর চিন্তার অভ্যাস-গুলি প্রকাশ করে ফেলে। তাই, শ্রীমিত্র যখন বলেন যে অভিনয়কে জীবন্ত করে তুলতে হলে বলার ধরনকে 'যতদূর সম্ভব দৈনন্দিন কথোপকথনের যে শব্দের ছক আছে' তার কাছাকাছি আনা দরকার, আর তাতে করে বলার ধরনের মধ্য দিয়ে 'সমসাময়িক বাস্তবের একটা বোধ' প্রকাশ পায়—তখন এই 'বাস্তবের বোধ' কথাটির তাৎপর্য খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে অনুকরণের মাধ্যমে বাইরে থেকে নয়, বরং বাস্তবের একেবারে অন্দর থেকে অভিনয়কে সত্য করে তোলার কথা বলছেন তিনি। আর, তখন হয়তো মনে পড়তে পারে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার আন্দ্রেই তারকভস্কি বলেছিলেন যে, কবি কখনোই এই বিশ্বজগৎকে বর্ণনা করেন না তাঁর কাব্যে বরং এই পৃথিবীর সৃষ্টির কাজটায় তিনিও হাত লাগান। সংলাপের প্রসঙ্গ উঠে পড়লে লেখক যা বলেন তার তাৎপর্য গভীরভাবে ভেবে দেখবার মতো। তিনি বলেন যে সংলাপের যতটুকু ওপরে দেখা যায় সেটুকু জলে ভাসা বরফের ওপরকার অংশটির মতো, তলায় থাকে অনেকখানি। 'গভীর উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায়' এমন নাট্যচর্চায় যিনি আগ্রহী, রবীন্দ্রনাটককে আমাদের নাট্যের জন্য আবিষ্কার করেছেন যিনি, যিনি প্রযোজনা করেছেন রবীন্দ্রনাটক ছাড়াও ইবসেন, সোফোক্লেস যেমন আধুনিক ভাবতীয় নাটককারদের বহু নাটকও তেমনি—সংলাপ সম্বন্ধে এমন কথা তিনিই আমাদের বলে দিতে পারেন। শ্রীমিত্রের অভিনয় কিংবা তাঁর প্রযোজনা দেখার সময়ই তো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কেন জে. এল. স্টায়ান বলেন যে সংলাপ হল সেই কাঠামো যার সাহায্যে গড়ে তোলা হয় মঞ্চের তাৎপর্য। কিংবা কোনো একটি নাটক তিনি অভিনয় করবেন জেনে যখন সেই নাটকটি পড়ে নিয়ে তাঁর অভিনয় দেখতে গিয়েছি, বা অভিনয় দেখে এসেই সেই নাটকটি পড়তে বসেছি তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্তানিস্লাভস্কি 'সাব-টেকস্ট' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। শ্রীমিত্র যে বলেন, '...সংলাপটা কেবল-মাত্র চরিত্রগুলোর আবেগ প্রকাশ করার জন্যে বা গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নয়। সংলাপে আরো ঢের জিনিস প্রকাশ পায়।...' সেই 'ঢের

প্রকাশ'-এর এক একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে তাঁরই নানা অভিনয়ের স্মৃতি ভিড় করে আসে মনের মধ্যে। গ্র্যানভিল বার্কার একবার এক চিঠিতে জাকস কোপো-কে লিখেছিলেন যে নাট্যকলা আদতে অভিনয়-কলা—'first, last and all the time'। নাট্যকলা কাকে বলে সেই আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে শ্রীমিত্র কিন্তু সারাক্ষণই বুনে চলেন অভিনয়-কলা সম্বন্ধীয় নানা কথা নানা ইঙ্গিত। মনোযোগী এবং শিশিক্ষু পাঠক নিশ্চয়ই ছেঁকে নিতে পারবেন সেই প্রয়োজনীয় পাঠ। '…মহৎ নাট্যকলার প্রত্যেকটা চরিত্রের একটা জীবনদর্শন আছে। এক এক ভাবে তারা জীবনটাকে দেখেছে এবং দেখছে।…' এই একটি সূত্র থেকেই অভিনয়ে আগ্রহী যারা তাঁরা গড়ে নিতে পারেন নাটক এবং নাট্যাভিনয়ের বিচারের ধরন। শিক্ষানবিশির স্তর ছেড়ে অভিনেতা কখন শিল্পীপদবাচ্য হয়ে ওঠে তার স্পষ্ট হদিশ দিয়ে দেন লেখক তাঁর এই আলোচনায়, বুঝিয়ে দেন অভিনেতা যেহেতু নিজেই যন্ত্র আবার নিজেই যন্ত্রী তাই কোনখানে সে কেমন করে অসহায়। মহলার তাৎপর্য কী তা ব্যাখ্যা করেন আর অভিনয়ে দৈহিক ভঙ্গি, নির্দেশকের ভূমিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন আলোচনার সমাপ্তির দিকে।

লেখকের মতে, নাটককার আর অভিনেতার যুগ্মাকৃতি এই নাট্যকলার কেন্দ্রে থাকে মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ—বহুস্তর আর বহুপার্শ্বসমন্বিত মানুষ এবং তার সম্পর্কগুলি। জীবনকে বুঝতে-বুঝতে নাট্যে মগ্ন হওয়া—আবার নাট্যকলাকে বুঝতে-বুঝতে জীবনে মগ্ন হওয়া—এই চলেছে যাঁর সারা জীবনভর তাঁর পক্ষেই সম্ভব ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির—ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্কগুলির টানাপোড়েনের নানা স্তর নানা পার্শ্বের কথা অমন প্রাঞ্জল করে আলোচনা করা।

নাট্যকলায় যাঁরা আগ্রহী তাঁরা এই গ্রন্থটি, আমরা জানি, অবশ্যই পড়বেন। চিন্তার দিগন্ত পলকে উন্মোচিত করে দেবার মতো অনেক কথা তাঁরা পাবেন এতে, পাবেন নিজেদের ভাবনার গলদগুলি বুঝে নেবার অপার সুযোগ—যদি না পূর্বে স্থিরীকৃত ধারণাজনিত কোনো অন্ধত্ব বা একগুঁয়েমিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাঁদের বিচারবোধ। বইটি পড়া শেষ হলে শুধু একটিই খেদ হয়, যদিও অল্পেই বিস্তর বলার অসাধারণ দক্ষতা তাঁর আয়ত্ত, তবু আরও খানিক বিশদ হলেন না কেন তিনি—নাট্যে সংলাপের বহুমুখী ভূমিকা বা অভিনয় চলার সময় মঞ্চের ওপর বিভিন্ন চরিত্রের অবস্থান ও তার পরিবর্তন এবং অভি-নেতাদের চলন ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত নাট্য-আততি কিংবা নাট্য গড়ে তোলায় নির্দেশকের সহযোগ ও সহভাগ এবং মঞ্চসজ্জা, আবহ, আলো ইত্যাদির ব্যবহারের ভূমিকা প্রভৃতি কিছু-কিছু সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে! অবশ্য, এই খেদ অনুভবের মুহূর্তেই মেনে নিতে হয় যে এই গ্রন্থ আসলে একটি বক্তৃতার লিপিবদ্ধ রূপ মাত্র—যে বক্তৃতার স্বল্প-অবকাশে তিনি চাইছিলেন তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করে সৃষ্টি-রহস্যের অন্দরে সহজ আত্মীয়তার আসন পেতে বসাতে তাঁর শ্রোতাদের। আর, সেই দুরূহ কাজটি এমন অনায়াসে সম্পন্ন করার মতো যোগ্যতা আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শ্রীশম্ভু মিত্র ব্যতীত আর কারোরই নেই।

প্রবন্ধ গল্প আর কবিতার কয়েকটি সংকলন, অনুবাদ এবং কালপঞ্জী

রণেশ্রনাথ দেব

"এবারক্রম্বির সাহিত্য সমালোচনা" নামটি দেখে প্রথম মনে হয়েছিল এটি এবারক্রম্বির সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা। পরে বোঝা গেল এটি অনুবাদ। লেসিলিস এবারক্রম্বি -রচিত "প্রিনসিপলস অব লিটারারি ক্রিটিসিজম্" গ্রন্থের ভাষান্তরিত রূপ। এবারক্রম্বির গ্রন্থটি ছাত্রমহলে সুপরিচিত, যদিও এখন বইটি তত সমাদৃত নয়। এরকম একটি নাতিবৃহৎ সমালোচনাগ্রন্থের অনুবাদ হওয়া অবশ্যই কাম্য।

গ্রন্থের প্রারম্ভে অনুবাদক এবারক্রম্বির জীবন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ৩৫-পৃষ্ঠাব্যাপী একটি আলোচনা যোগ করেছেন। এতে এবারক্রম্বির জীবনকথা বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদ অংশ সর্বত্র স্বচ্ছন্দ নয়। কোথাও-কোথাও ভাব অনুসরণ করা ক্লেশকর হয়। যেমন 'এরূপে একজন জীববিজ্ঞানী বাস্তব স্বতন্ত্র প্রাণীকুলের পরীক্ষার দ্বারা চালিত হতে পারেন 'মানুষ' অথবা 'কুকুর' এরকম প্রাণীর একটি প্রজাতির সাধারণ ধারণার দিকে। একটি প্রজাতির ধারণা যথেষ্ট বাস্তব এবং এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে এটি বাস্তব মানুষ এবং কুকুর সম্পর্কে ধারণা। জীব-বিজ্ঞানের দিক থেকে বলতে গেলে, ধারণার যা কিছু বাস্তবতা আছে তা প্রদত্ত হয় বস্তুর বাস্তবতার দ্বারা। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের দিক থেকে বলতে গেলে, বস্তুর যা কিছু বাস্তবতা আছে তা প্রদত্ত হয় ধারণার বাস্তবতার দ্বারা।' (পৃষ্ঠা ৯৬)।

মূল ইংরাজি লেখায় রয়েছে—

Thus, the biologist may be led by the study of actual individual creatures to the general idea of a species of creature, Man or Dog. The idea of a species is real enough; but it is real only because it is the idea of real men and dogs. Biologically speaking, the reality of things gives to ideas whatever reality they possess. But mathematically speaking, the reality of ideas gives to things whatever reality they possess.

বাঙলার চেয়ে ইংরাজি অংশ বেশি সুবোধ্য।

অনুবাদক টীকা-টিপ্পনী অংশে পরিশ্রম করে অনেক তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু Purple Patch-এর বাঙলা কি 'নীললোহিতের পোঁচ'? অথবা Homer Nods বলতে বোঝাবে 'হোমার মস্তক দোলান'?

ইংরিজি প্রবন্ধসংকলনটিতে আবু তাহের মজুমদার প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "বসন্ত" নাটিকা বিষয়ে একটি আলোচনা আছে। নজরুল সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ ও জসীমুদ্দীন বিষয়ে একটি রচনা রয়েছে। নজরুলের মূল্যায়নে যুক্তির চেয়ে আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। জসীমুদ্দীনকে কীটসের সঙ্গে

এবারক্রম্বির সাহিত্য সমালোচনা—আবু তাহের মজুমদার অনূদিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ ২২৫। পঞ্চান্ন টাকা।

Literary and other Essays—Abu Taher Mojumder. Poonam Prakashani. 254 Elephant Road, Dhaka. Rs. Forty

বাংলা কবিতার কালপঞ্জী (১৯২৭-১৯৮৯)—সন্দীপ দত্ত। র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা-৯। জানুয়ারি ১৯৯০। পৃ ১৬৮+৪। চল্লিশ টাকা।

পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতা ১৯৪১-১৯৯১—সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু। একক প্রকাশনী, কলকাতা-২৬। জানুয়ারি ১৯৯১। পৃ ১৭৬+৬। আশি টাকা।

অমৃতলোক-ভারতীয় সাহিত্য সংখ্যা, পঞ্চদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, অগস্ট '৯১। সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত। মেদিনীপুর। পৃ ২৫৭। কুড়ি টাকা।

তুলনা করার যৌক্তিকতা কোথায় বোঝা গেল না। "লাল সালু" উপন্যাসের বিশ্লেষণও আবেগদীপ্ত, যদিও শেষ অংশে সমালোচক বলেছেন "লালসালু" মহৎ উপন্যাস নয়। একটি ভালো উপন্যাস মাত্র। আর-একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে এমার্সন, হুইটম্যান, হথর্ন ও লংফেলোর উপর প্রাচ্য চিন্তা, কাব্য ও দর্শনের প্রভাব বিচার করা হয়েছে। শেষের তিনটি প্রবন্ধের বিষয়—বিবৃতিদান ও হরতাল ডাকার রীতি, আমাদের সামাজিক দায়িত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজনীতি। লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিদেশে শিক্ষা-লাভ করার ফলে উন্নত শিক্ষাদানপদ্ধতির সঙ্গে সুপরিচিত। তাঁর পক্ষে বর্তমানের ঘৃণ্য রাজনীতি কবলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশ অসীম মর্ম-যাতনার কারণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং পাঠকেরা তাঁর সঙ্গে একমত হবেন; কিন্তু এর অবসান হবে কবে? শিক্ষক-অধ্যাপকদের কি কিছুই করণীয় নেই?

গ্রন্থকারের ভাষা সাধারণ, আটপৌরে বিশেষত্ব-হীন। তবে একটি রচনা মনে কিছুটা দাগ কাটে। সেটি হল কবি ডে লুইসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

"বাংলা কবিতার কালপঞ্জি" বইটি একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যগ্রন্থ। ১৯২৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত প্রতি বছরে কোন্-কোন্ বাঙলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে, লেখক প্রচুর পরিশ্রম করে তা বার করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে ধরেছেন। প্রথমে দেওয়া হয়েছে বিশেষ বছরটির ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। এরপর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকা। তারপর ওই বছরটিতে যে-যে বাঙালি কবি জন্মেছেন তাঁদের নাম। ঘটনাপ্রবাহ অংশটুকু সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুনির্বাচিত। কাব্যগ্রন্থসমূহের নামও বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সন্ধান করে আনা হয়েছে। কোনো কাব্য অনুল্লেখিত থেকে গেছে এমনটি চোখে পড়ল না। এরকম যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত কালপঞ্জি আজকাল দুর্লভ বললেও চলে। গত ষাট বছরের বাঙলা কাব্যের আলোচনায় এ বই অপরিহার্য হয়ে রইবে। কেবল আক্ষেপ হয় সংকলক সূত্রপাত কেন ১৯২৭ সালে করলেন। ১৯০১ সাল থেকে শুরু করলে একটা গোটা শতাব্দীর কাব্যচিত্র আমাদের হাতে এসে যেত। যতটুকু পেলাম ততটুকুই মূল্যবান। সংকলককে সাধুবাদ জানাই।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু খ্যাতিমান কবি। আধ শতাব্দী ধরে "এককে"র মতো একটি সুন্দর কবিতার পত্রিকা বার করে আসছেন। "এককে"র সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এই সংকলনটির প্রকাশ মূল্যবান এবং বহু প্রত্যাশার সামগ্রী। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, অনেকটা নিরাশ হতে হয়েছে। ভেবেছিলাম, "এককের" পৃষ্ঠা থেকেই কবিতাগুলি সংগৃহীত। দেখা গেল, তা নয়। তিনশো জন কবির একটি করে কবিতা সংকলিত হয়েছে। (তিনশো কেন? উপলক্ষ কি কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি? এর সঙ্গে "এককে"র যোগ কোথায় বোধগম্য হল না।) এবং সে কবিতা-নির্বাচনও শুদ্ধসত্ত্ব বসুর নিজের রুচি আর বিবেক অনুযায়ী হয় নি। তাঁর কবিবন্ধুরা দশ বারোটি তালিকা দিয়ে-ছিলেন, তা থেকে তিনি বেছে নিয়েছেন মাত্র। শুদ্ধসত্ত্ববাবু নিজে কবি হয়ে কি বোঝেন না, এরকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিনেটের নির্বাচন হতে পারে, কবিতার মূল্যায়ন হয় না? ভূমিকায় সম্পাদক দাবি করেছেন 'এই কাব্যসঙ্কলনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এর নির্দলীয় চরিত্রগৌরব। নানা বিষয়ে সমালোচনা-যোগ্য হলেও এখানে কোনো গোষ্ঠীপ্রীতি নেই, কোনো গোষ্ঠীর প্রতি অবহেলাও নেই।' কথাটি নিঃসন্দেহে খাঁটি। কিন্তু হায়, গোষ্ঠীপ্রীতির ঊর্ধ্বে ওঠাই কাব্যসংকলকের একমাত্র দায়িত্ব নয়।

প্রখ্যাত কবিদের লেখা নির্বাচনে সবসময় তাঁদের বিখ্যাত কবিতাগুলি বেছে নেওয়া হয় নি। এটা ভালোই হয়েছে, কারণ ওরকম হলে আরো ক'টি কাব্যসংকলনে ধৃত কবিতার পুনর্মুদ্রণ পেতাম। কিন্তু সবার কবিতা তাঁদের প্রতিভূস্থানীয় হয় নি। ভালো

কবিতা এবং অতি সাধারণ কবিতার এই সাড়ে বত্রিশ ভাজা থেকে সুখাদ্য বেছে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের ওপরেই বর্তাল।

স্বাধীনতালাভের পরে যেসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের চেতনার অগ্রগতি হয়েছে তার একটি হল ভারতীয় সাহিত্যের সমগ্র রূপ বিষয়ে অবহিত হওয়া। জাতীয় সংহতির ধারণা এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাহিত্য অকাদেমির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা আর সাহিত্যের মধ্যে সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে। সাহিত্য অকাদেমি আমলা-কবলিত হয়েছে কিনা এবং অনুবাদ ভিন্ন আর কোনো ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে কিনা, সেই বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যিকদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপনে এবং ভাবের আদানপ্রদানে অকাদেমির দান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত ব্যক্তি তথা সাহিত্যপ্রেমীরা নিজের-নিজের সাহিত্যের বাইরেও অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যকৃতির খবর রাখার চেষ্টা করেন, এটা অকাদেমির ত্রিশ বছরের পরিশ্রমের একটি ফল নয় কি? অকাদেমিই কি আমাদের শেখায়নি—ভারতের ভাষা বহু, কিন্তু সাহিত্য এক? গত অর্ধ শতাব্দীতে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি বিস্ময়কর। এমনও সাহিত্য ছিল যা পঞ্চাশ বছর আগে শুধু অনুবাদে পূর্ণ হত। আজ তা সবল-ভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। মণিপুরী নাটকের অগ্রগতি অনেককেই বিস্মিত করে দিয়েছে। অকাদেমির প্রদর্শিত পথে সম্প্রতি এগিয়ে এসেছেন "অমৃতলোক" পত্রিকা। "ভারতীয় সাহিত্য সংখ্যা"য় তাঁরা অসমিয়া, ইংরেজি, উরদু, ওড়িয়া, কন্নড়, কাশ্মীরি, গুজরাতি, তামিল, তেলুগু, নেপালি, পঞ্জাবি, বাংলা, মণিপুরী, মৈথিল, মারাঠি, মালয়ালম, রাজস্থানি, সংস্কৃত, সাঁওতালি, সিন্ধি ও হিন্দি থেকে ৩৪টি কবিতা ও ২১টি গল্প সংগ্রহ করেছেন। বলা বাহুল্য বাঙলা ছাড়া আর সবগুলিই অনুবাদ। মূল কবিতা ও গল্প নির্বাচনেও তাঁরা অকাদেমির পত্রপত্রিকার দ্বারা বহুভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের নিষ্ঠা ও উৎসাহ প্রশংসনীয়। মনে হয় সব অনুবাদই ইংরিজি থেকে হয়েছে (সাঁওতালি ছাড়া)। সুতরাং এগুলো অনুবাদের অনুবাদ। তবু স্বাগত জানাবার মতো।

কবিতার অনুবাদ বিষয়ে কিছু বলব না। কবিতার ভালো অনুবাদ অতি দুর্লভ এবং অতি শক্তিশালী কবির কর্ম। কেউ-কেউ এমনও সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন—কবিতার অনুবাদ আদপেই সম্ভব কিনা। কিন্তু গল্পগুলির অনুবাদ পাঠকের পক্ষে তৃপ্তিকর। এসব গল্পে আঞ্চলিক জীবনযাত্রার আর এক-একটি জনগোষ্ঠীর জীবনদৃষ্টির পরিচয় আমাদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। ইন্দ্রবাহাদুর রাই ও সুফী গুলাম মুহম্মদের গল্প দুটি নেপালের ও কাশ্মীরের জীবনের তাপে পূর্ণ। ইসমত চুগতাই-এর "ছোটপ্রাণ" গল্পটির অ্যানটি-ক্লাইম্যাক্স বিশেষ উপভোগ্য। দুয়েকটি গল্প অবশ্য আঞ্চলিক বর্ণহীন। কমলা দাশ ও আর কে নারায়ণের গল্প দুটি সাম্প্র-দায়িকতার বিপক্ষে জোরালো প্রতিবাদ। আবার কিশোরীচরণ দাসের গল্প ভিন্ন-প্রদেশবাসীর দৃষ্টিতে কলকাতার রূপটিকে অন্য আলোকে দেখায়। এসব গল্পের সঙ্গে বাঙলা গল্পের বর্তমান ধারাটির পার্থক্য কোথায় তা-ও অনিল ঘড়াই এবং ভগীরথ মিত্রের গল্প দুটি পড়ে বোঝা যায়।

পত্রিকার শেষভাগে লেখক-পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। সম্পাদকীয়টি সুলিখিত। এস বালুরাও-এর "ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহ্য ও নিরীক্ষা" কিছু-কিছু ভ্রম সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য। তবে "প্রসঙ্গ: অনুবাদ সাহিত্য" আলোচনাটির বক্তব্য সর্বত্র স্পষ্ট নয়।

শিল্পে বিমূর্ততার ক্রমবিকাশ : ভাসিলি কানডেনস্কির ভূমিকা

অসীম রেজ

সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ধ্যান-ধারণা এবং মূল্যবোধও পরিবর্তিত হতে থাকে। আমাদের সভ্যতার ইতিহাস এইভাবে ক্রমান্বয়ে একটা বিশ্বাস থেকে আর-একটা বিশ্বাসে, একটা অভ্যাসের ছক থেকে আর-একটা অভ্যাসের ছকে মানুষকে বাঁধছে। এক শতকের মূল্যবোধ আর ধ্যান-ধারণা অপর শতকে সম্পূর্ণ পালটে যাচ্ছে, ভাঙছে, পরিবর্তিত হচ্ছে, আবার নতুনভাবে রূপ নিচ্ছে। কোনো কিছুই স্থির থাকছে না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি যা সত্য বলে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, পরমুহূর্তেই আবার তা চ্যালেনজের মুখোমুখি হচ্ছে। কখনও বা তা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হচ্ছে। কোনো কিছুকেই ধ্রুব সত্য বলে আমরা মানতে পারছি না। অথচ অজানাকে জানার আগ্রহ আমাদের ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। অতি দ্রুত বেড়ে উঠেছে আমাদের সচেতনতা। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে চলেছে, আবিষ্কারের পর আবিষ্কারে মেতে উঠেছি আমরা, যা কিছু অজ্ঞেয়, অজানা—তার দিকে পাড়ি দেবার এক দুর্বার প্রেরণা যেন কাজ করে চলেছে সর্বদা।

যন্ত্রসভ্যতার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সভ্যতার উপকরণ গিয়েছে পালটে। যন্ত্র যেমন এক-দিকে জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণের নতুন সম্ভার সাজিয়ে চলেছে, তেমন এই জটিল যন্ত্রজীবনে অতিদ্রুত বেড়েছে প্রতিযোগিতার মনোভাব, অবিশ্বাস, বেগ আর উদ্বেগ। নির্ভুল নিখুঁত পারিপাট্যের মধ্যে এসেছে ক্লান্তিকর একঘেয়েমি আর অন্তঃসারশূন্যতা। যন্ত্রের প্রভাবে মানুষ কতকগুলি আবেগহীন নিরুত্তাপ রোবটে পরিণত হয়েছে। অরণ্য কেটে মানুষ তৈরি করেছে নতুন বসত। গড়ে উঠেছে নতুন শহর, নতুন বন্দর। এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য গিয়েছে নষ্ট হয়ে। একদিন যে প্রকৃতি তাকে ধারণ করেছে, তার থেকে ক্রমশ সে নিজে গিয়েছে সরে—দূরে, বহুদূরে। যে যন্ত্র সে নিজেই আবিষ্কার করেছে, সেই যন্ত্রই আবার এক ভয়ানক অস্ত্র হয়ে তার উপর আঘাত হেনেছে।

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ আর মননের প্রসারের ফলে মানুষের পুরোনো সামাজিক বন্ধন আর সংস্কার যাচ্ছে কেটে। বিজ্ঞান মানুষকে শেখাচ্ছে যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস ভেঙে ফেলতে। পরমার্থবোধ গিয়েছে প্রায় লুপ্ত হয়ে। নীৎশের ভাষায় ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে, স্বর্গোদ্যান শূন্য বোধ হয়।

ইতিমধ্যে মনোবিজ্ঞানের ঘটল আবিষ্কার। মানুষ জানতে চাইল তার ভিতরের কথা, অবচেতনের কথা। ভিতরে-ভিতরে যে অবদমিত ইচ্ছারা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, সে যেন তার থেকে মুক্তি চাইল। আবার মানুষের মনোগত জীবন চেয়েছে নিজেকে বাহ্যরূপে সর্বদা প্রকাশ করতে, নানাভাবে বাইরের রূপ ধারণ করতে। সে যেমন চায় সকল কর্ম-প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করতে, তেমন প্রকাশপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করতে; চায় রূপ নির্মাণ করতে এবং ওই রূপের মাধ্যমে অপরের সাথে যুক্ত হতে। আর সব-শেষে থাকে শুদ্ধ প্রেরণা, যার ফলে মানুষ জানতে চায় সব কিছু যা আছে, জানতে চায় সে কী, আর অন্যান্য প্রবৃত্তিরা তাকে দিয়ে কী করিয়ে নিচ্ছে।

আর ওই প্রেরণা যতই ব্যাহত হয়, বিচ্ছিন্নতা জাগে। সভ্যতার এই দ্রুত পরিবর্তনকে মানুষ একদিকে যেমন কিছুতেই আত্মসাৎ করতে পারছে না, তেমনি অন্য-দিকে মানুষের মন আর সভ্যতার উপকরণের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক বিরাট ফারাক। সভ্যতার চেয়ে মানুষ পড়েছে পিছিয়ে। সে হয়েছে একাকী, নিঃসঙ্গ।

অতিরিক্ত বস্তুমুখিতার ফলে ধীরে-ধীরে সে টের পায় বস্তুর অন্তঃসারশূন্যতা। একদিকে যেমন তা তার মনে নৈরাশ্যের ক্ষত তৈরি করেছে, তেমনি আত্মিক অন্বেষণের পরিধি গিয়েছে মিলিয়ে এক ধূসর অন্ধকারে। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের প্রতি আস্থা গিয়েছে কমে, সে হয়েছে কেন্দ্র-চ্যুত; আর শুধু আবর্তিত হয়েছে এক অন্তহীন জটিল আবর্তে। প্রতিটি বস্তু যেন শিকড় হারিয়ে এক অনড়, জড় অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। সকল কিছুর ভিতর 'আত্মা' (soul) গিয়েছে হারিয়ে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ শতাব্দীর মানুষ নতুন-ভাবে পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে। একদিকে পুরোনো মূল্যবোধ, বিশ্বাস যেমন ধ্বংস হয়েছে, তেমন অন্য-দিকে নতুন সংস্কার নতুন বিশ্বাসকে খুঁজে বেরিয়েছে।

বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব থেকে মুক্তির অভীপ্সা

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের শিল্পীর দায়ভার যেন বহুগুণ বেড়েছে। তাঁর সবচেয়ে বড়ো ভাবনা অস্তিত্বের এই নিদারুণ সংকট থেকে মানুষকে তিনি কীভাবে পথ দেখাবেন। তাঁর সৃষ্টিকর্মের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল ওই বিচ্ছিন্নতা আর একাকিত্বের বোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা ও বহু মানুষকে ওই একই ধরনের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি দেওয়া। অন্য সবার মতো শিল্পীও বাস্তবে পরাঙ্মুখ হয়ে উঠেন, বস্তু বা বিষয় (object) তাঁর কাছে হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর, একঘেয়ে। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমস্ত আকর্ষণ, এমনকি সমস্ত কামনা বা 'লিবিডো'-কে কল্পনা-জীবনের ইচ্ছা সৃষ্টির দিকে চালিত করতে চান। আর এক আশ্চর্য ক্ষমতার সাহায্যে তিনি ব্যক্তিগত উপাদানের রূপ বদলে দিতে সচেষ্ট হন। যদিও ভিতরের প্রয়োজনে সৃষ্টির প্রতি তাঁর অহরহ অনুপ্রেরণা জাগছে, তবু বাইরের প্রয়োজনে সমষ্টি-মনের সাথে যুক্ত হওয়ার তাগিদটাও কম নয়। এরই প্রয়োজনে শিল্পী যেন ফিরে যেতে চান উৎসের দিকে, তাঁর সৃষ্টির মূলে, তাঁর আদিম সরল প্রকৃতিতে। তিনি যেন ফিরে যেতে চান সমস্ত যুক্তি আর লজিকের বাইরে সৃষ্টির আপন নিয়মের দিকে। সমস্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে এক অখণ্ড বোধের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চান। এ যেন এক সাধনার মতো। এ সাধনার লক্ষ্য যেন যে বিশেষ মাধ্যমকে আশ্রয় করে শিল্প গড়ে ওঠে তার প্রকৃতির সীমাকে অতিক্রম করে, তার খণ্ডসত্তাকে অতিক্রম করে, সমগ্র চেতনায় ব্যাপ্ত সজ্ঞান থেকে নিরজ্ঞানে (collective unconscious), একক সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া। এ এক তন্ময়তা। শিল্পী তাঁর শিল্পসত্তার ভিতর যান হারিয়ে। এখানে নাম আর রূপ একাকার হয়ে যায়, বুদ্ধি আর বোধের মধ্যে ঘটে শুভমিলন। শিল্পভাবনা ও বৈজ্ঞানিক মননের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটে। শিল্প আশ্রয় করে বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞান আশ্রয় করে শিল্পকে।

জটিল নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবনে একদা হারিয়ে-যাওয়া রোমানটিক কবিত্বময় মনটি ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আবার তিনি যেন ফিরে যেতে চান স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের উৎসধারায়, চেতনার উষা-লগ্নে, অবচেতনে, শিশুর দেখা বিস্ময়ের জগতে। দেশকালজাতিভেদে এক সার্বজনীন ভাষার খোঁজে তাঁর সৃজনশীলতা শিকড় মেলে বিস্মৃতপ্রায় আদিম অভিজ্ঞতায় অথবা এক অজানা অতীত অন্ধকারে। এক নতুন বিশ্বাস আর আশ্রয়ের খোঁজে তাঁর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের নবীকরণ ঘটে নতুন-নতুন

প্রতীকী অর্থে। আদিম বিশ্বাসগুলি নতুন আকারে, নতুন রূপে আবির্ভূত হয় নানান রূপকল্পে বা পুরা-প্রতিমায় (archetype)। ধীরে-ধীরে বহির্জগৎ থেকে শিল্পীরা নিজেদের গুটিয়ে আনতে চাইলেন অন্তর্জীবনে। তাঁরা জানলেন বাইরের দিক থেকে নয়, শিল্পকে ধরতে হবে ভিতরের দিকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এ প্রবণতা যেন আরো তীব্রতর হতে থাকে। ইতিমধ্যে জাপানি ছাপাই ছবি চলে এসেছে ইউরোপের বাজারে। আফ্রিকা, আমেরিকা আর মহাসাগরীয় অঞ্চলের আদিম শিল্পকলা নিয়ে রীতিমত শুরু হয়েছে আলোচনা আর মৌলিক গবেষণা। এগুলি নিয়ে কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন ঘটেছে পারিতে (১৮৫৫ ও ১৮৮৯) ও লিৎজিপে (১৮৯২)। প্রাচ্যদেশীয় ধ্যান-ধারণা দর্শন নিয়ে ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত ঘটেছে রাশিয়ায় জার্মানিতে। উন্নত মানের ফটোগ্রাফি ক্রমশ শিল্পের স্থানকে করছিল সংকুচিত। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের সূত্র গেল বেড়ে। উইলিয়াম জেমসের মনস্তত্ত্বের সূত্রাবলী (১৮৯০) নতুন ভাবে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে আমাদের। সংগীতে চাইকোভস্কির অমর সৃষ্টি (Swanlake, ১৮৭৬) ও ভাগনারের শেষতম সংযোজন (Parsifal, ১৮৮২) আমাদের মুগ্ধ করেছে। আর ১৮৬৩ সালে এডুয়ার মানের ছবি ঝড় তুলেছে শ্যাঁলোতে।

সেজান, ভ্যান গখ আর গোগ্যাঁ

এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনাচিন্তা দানা বেঁধে উঠতে লাগল। বেরিয়ে এলেন আধুনিক শিল্পের আধুনিক শিল্পের তিন প্রবাদপুরুষ—সেজান, ভ্যান গখ, গোগ্যাঁ। মনের কথা জানিয়ে সেজান জানালেন, 'আমি কখনই প্রকৃতির হুবহু প্রতিলিপি আঁকবার চেষ্টা করি নি, আমি প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করেছি মাত্র' ; ভ্যান গখের কথায়, 'আমার ভিতর কিছু একটা রয়েছে, সেটা কী', আর আবেগমথিত চিত্তে গোগ্যাঁ বলে উঠলেন—'এর চেয়ে ঢের ভালো স্মৃতি ঘিরে ছবি আঁকা, তোমার হৃদয় জেগে উঠবে।' সেজানের প্রকৃতির ভিতর মৌন গঠন খুঁজে বের করার তাগিদ, ভ্যান গখের শিল্পে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় অভিব্যক্তি, সর্বোপরি গোগ্যাঁর আদিমতাপ্রীতি ও রহস্যময় সারল্য শিল্পকে এক নতুন চেহারা দিল। গোগ্যাঁর শিল্পে অলঙ্কারধর্মী নির্দিষ্ট নির্বাচন ও অমিশ্র রঙ ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রাচ্যদেশীয় নকশার ঢঙে ছবি আঁকলেন মাতিস আর 'ফভে'রা। সেজানের সূত্র ধরে জ্যামিতিক রূপে ছবিকে বাঁধলেন কিউবিস্টরা। এরই সার্থক পরিণতি ঘটল পিকাশো ও ব্রাকে। একদিকে মাতিস রঙকে সকল রকম প্রাকৃতিক শর্তাধীনতা থেকে মুক্ত করে রঙের নিজস্ব বাস্তবতাকে স্বীকার করলেন, অন্যদিকে পিকাসো ফর্মকে অজস্র জ্যামিতিক আকারে ভাঙতে-ভাঙতে দেখালেন ফর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিকে। তিনি বললেন, 'যা দেখি আমি তা আঁকি না, আঁকি যা আমি জানি' ('I do not paint what I see, I paint what I know')।

দি ব্রিজ

অস্থির হৃদয়ের আবেগময় অভিব্যক্তি ও আদিমতার প্রতি আসক্তি নিয়ে যে শিল্পীগোষ্ঠী এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে (১৯০৫ সালে) জার্মানির ড্রেসডেনে সংগঠিত হলেন তাঁরাই 'দি ব্রুকে' (De Brücke) বা 'দি ব্রিজ' নামে চিহ্নিত হলেন। এঁদের শিল্পরীতি 'একসপ্রেশনিজম' (Expressionism) বা অভিব্যক্তিবাদ নামে খ্যাত হল। অভিব্যক্তি-বাদের মূলকথা হল শিল্পে ব্যক্তিগত মেজাজ মর্জি বা মুডকে ব্যক্ত করা ; ব্যক্তির সমস্ত রকম মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা যন্ত্রণাকে এক জোরালো আবেগ-ময় অভিব্যক্তির ভিতর ধরে রাখা। অঙ্কনরীতির ক্ষেত্রে তাঁরার এক সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রত্যক্ষ আবেদনকে তাঁরা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন এবং 'ফভ' শিল্পীদের মতো রঙ ও রেখার ক্ষেত্রে পূর্বতন সকল শর্তকে অস্বীকার করে এক প্রবল মানসিক উত্তেজনা ও টেনশনকে তুলে ধরলেন রেখা আর রঙের নিয়ন্ত্রণহীন বিকৃতিতে। অবরুদ্ধ আবেগ যেন অতর্কিতে অর্গলহীনভাবে ভেঙে পড়ল শিল্পের শরীরে। আর ওই শরীর জুড়ে সর্বদা জেগে থাকল এক বিষাদময় শূন্যগর্ভ অস্তিত্ব। এক ভয়ানক নৈঃশব্দ্য জুড়ে চীৎকারের মতো ধ্বনিত হল আমাদের নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব (প্রসঙ্গত এখানে ম্যুনউ-এর 'দি ক্রাই' ছবিটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে)।

ইয়ংস্টাইন

অভিব্যক্তিবাদীদের এমন শিল্পরীতির পিছনে সেদিন অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল ম্যুনিখে এক নব্য শিল্পরীতির আন্দোলন যা 'য়ুগেনস্টীল' (Jugend-stil) বা 'ইয়ংস্টাইন' নামে পরিচিত। এঁরাই প্রথম আবিষ্কার করলেন আদিম, মধ্যযুগীয়, প্রাচ্যদেশীয় শিল্পরীতির সকল অলংকরণের ভিতর এক সরল বিমূর্ত সৌন্দর্যকে ও প্রাচীন শিল্পকলার নকশাধর্মী জ্যামিতিক রূপটিকে শিল্পের মূল নান্দনিক ভিত্তি হিসাবে দাঁড় করাতে চাইলেন। ফিরিয়ে আনতে চাইলেন পুরোনো জার্মান কাঠখোদাই-শিল্পের অন্তর্নিহিত কর্কশ শক্তি ও নিগ্রো ভাস্কর্যের আদিম বর্বরোচিত প্রাণস্পন্দনকে। এ ছাড়া এই শতাব্দীর প্রথমদিকে জার্মানিতে শিশুদের শিল্পশিক্ষণ নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল, পরোক্ষে তা 'ব্রুকে' গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করল। এই গোষ্ঠীর অন্যতম শিল্পীরা ছিলেন কার্শনার (Kirchner) ম্যুনউ (Munch) ও নোলডে (Nolde)। তবে ব্যক্তিমনের এমন আবেগময় প্রকাশকে আরো সংযত অন্তরমুখী করে তুললেন আর-এক দল শিল্পী জার্মানির ম্যুনিখ শহরে (১৯১১ সালে)। এঁদের যিনি নেতৃত্ব দিয়ে-ছিলেন তিনিই হলেন প্রকৃত অর্থে বিমূর্ত অভিব্যক্তি-বাদ বা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট একসপ্রেশনিজম'(Abstract Expressionism -এর জনক। আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের পথপ্রদর্শক, শিল্পী ভাসিলি কানডেনস্কি (Wassily Kandinsky)। ১৯০৩ সালে তাঁর আঁকা একটি ছবির নামকরণে এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হল 'ডার ব্লাউ রাইটার' (Der Blaue Reiter) বা 'দি ব্লু রাইডার'। শিল্পে অন্তর্জীবন উন্মোচনের কথা ঘোষণা করে কানডিনস্কি বলেন, 'I value only those artists who really are artists, that is, who consciously or unconsciously in an entirely original form, embody the expression of their inner life ; who work only for their end and cannot work otherwise.'

অন্তর্জীবনের এমন অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই দলের শিল্পীরা শিল্পে এক আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে স্বীকার করলেন এবং সমগ্র বিশ্বচরাচরের সঙ্গে সকল বস্তুকে এক আত্মিক সূত্রে গাঁথতে চাইলেন। সকল বস্তুর ভিতর এক আশ্চর্য প্রাণের (soul) সন্ধান পেলেন, এক ধরনের 'মিষ্টিক' বা অতীন্দ্রিয় বোধের দ্বারা তাঁরা আক্রান্ত হলেন।

কানডেনস্কি যেন আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন। বস্তুর আধ্যাত্মিক স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে তিনি প্রকৃতিরাজ্যের সকল বস্তুকে (object) বর্জন করলেন। বস্তুর পরিবর্তে বেছে নিলেন কতকগুলি রঙিন জ্যামিতিক আকারকে। এক আশ্চর্য মেল-বন্ধন ঘটালেন এই আকারগুলির ভিতর। ছবি হয়ে উঠল সংগীতের ধ্বনির মতো কতকগুলি ফর্মের ছন্দোময় স্পন্দন। কানডেনস্কির চিত্রকলায় এমন অভিনব আবিষ্কারের আলোচনা করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে পূর্বোক্ত কিছু-কিছু ঘটনার মধ্যে।

১৮৬৬ সালে ওঠা ডিসেম্বর মস্কোর এক প্রাচীনপন্থী সচ্ছল অভিজাত পরিবারে কানডেনস্কি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের বেশিরভাগ সময় কেটেছে ক্রিমিয়ার ওদেসাতে। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। ১৮৯২ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Political Economy & Law-এ স্নাতক হয়ে পরের বছরই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের Jurisprudence-এ লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্য অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের জন্য মাত্র ৩০ বছর বয়সে তাঁকে এস্তোনিয়ার ডোরপাট (Dorpat) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরের পদে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু শিল্পীজীবনকে শেষ পর্যন্ত বেছে নেওয়ার তাগিদে তিনি ওই পদে যোগ না দিয়ে মিউনিখে চলে আসেন।

শৈশব থেকেই সংগীত ও চিত্রকলায় ভালোবাসার কথা আমরা তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি। অল্প বয়সে তিনি চেল্লো আর পিয়ানো বাজাতে ভালোবাসতেন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকেই তাঁর ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। দেশীয় ঐতিহ্য-সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন গোটা রুশ সংস্কৃতিকে, বিশেষ করে অর্কেস্ট্রাধর্মী সংগীতের অমর সৃষ্টিগুলি (যেমন বেটোভেন, চাইকোভস্কি প্রমুখ), নৃত্যব্যালের ছন্দোময় অভিব্যক্তি, রাশিয়ার লোকশিল্প ও প্রাচীনধর্মীয় মূর্তিগুলি। শিল্পের ক্ষেত্রে রেমব্রানটের চিত্রকলা থেকে পিকাসো পর্যন্ত তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। সংগীতের ক্ষেত্রে ভাগনার, দেবুসি ও শ্যেনবার্গের (Wagner, Debussy and Schonberg) অমর সুরসৃষ্টি, নীৎসের (Nietzsche) দার্শনিক ভাবনা, মাদাম ব্লাভাৎস্কি (E. P. Blavatsky)-র অধ্যাত্মবিদ্যা এবং মেটারলিঙ্কের (Maeterlinck) রচনার প্রতি বিশেষ অনুরাগের কথা আমরা তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি। তবে বিশেষ করে যে ঘটনাটি তাঁকে আলোড়িত করেছিল তা হল ১৮৯৫ সালে মস্কোতে ফরাসি ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলার এক প্রদর্শনীতে মানের 'Haystack' ছবিটি দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এরই ভিতর যেন তাঁর ছবির ভবিষ্যৎ রূপটি খুঁজে পেলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি স্মরণীয় :

'I had the impression that here painting itself comes into the foreground. I wondered if it would not be possible to go further in this direction.'

আর এই পথের সন্ধানেই যেন ভবিষ্যতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

ম্যুনিখে আসার কিছুদিন পরেই কানডেনস্কি শিল্পী Anton Azbé-এর দু বছর পরে রয়াল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। এই সময় রূপকধর্মী ছবি অঙ্কনে পারদর্শী শিল্পী Franz Von Stuck-এর ক্লাশে যোগ দেন। কিন্তু ক্লাশের প্রথাধর্মী শিল্প-শিক্ষণের বাইরে একদল তরুণ শিল্পীর প্রগতিবাদী মনোভাব তাঁকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করল। এঁদের সঙ্গে একজোট হয়ে গড়ে তুললেন 'Phalanx' শিল্পীসংঘ।

Phalanx শিল্পীসংঘ

এই গোষ্ঠী শিল্পে একদিকে যেমন নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সমর্থন জানালেন, তেমনি অন্যদিকে নতুনদের কাজকে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। এঁরা একটি ছবি আঁকার স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন ও কানডেনস্কি সেখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়মিত ক্লাশ নিতে লাগলেন। তবে এই গোষ্ঠী আর বেশিদিন টিকল না। পরস্পরের ভিতর মতবিরোধের ফলে ওই দল আপনিই ভেঙে গেল (১৯০৫ সাল)। ইতিমধ্যে কানডেনস্কি চিত্রকলায় একটি নিজস্ব ঘরানা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন ও

ওই বছরেই প্যারিসে 'সালো দ্য অটমে' তাঁর ছবি গৃহীত হলে আন্তর্জাতিক ভাবে নিজেকে উপস্থিত করার বিরাট সুযোগ পেলেন। এই সময় তাঁর আঁকার প্রধান বিষয় ছিল রূপকথাধর্মী কাহিনীর কাল্পনিক উপস্থাপনা। এইসব ছবিতে সহজ স্বাভাবিক কাব্যধর্মী রূপটির পিছনে যুগেনস্টীল (Jugenstil শিল্পীদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবু কোথাও যেন তাঁর একটি অতৃপ্তি থেকেই যাচ্ছিল। নতুন কিছু আবিষ্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি বার হলেন ম্যুনিখ শহরের বাইরে।

অন্বেষা—১৯০৩-১৯০৮

ইউরোপীয় শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে ১৯০৩-১৯০৮ সাল পর্যন্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়ালেন জার্মানির অন্যান্য শহরে, ইতালি, হল্যাণ্ড, টিউনিশিয়া ও ফ্রান্সে। ফ্রান্সই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল ও তাঁর শিল্পীজীবনে এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলল। ১৯০৬-৭ সাল পর্যন্ত এক বছর প্যারিতে থাকার সময়ে তিনি 'ফভ' (Fauve) শিল্পীদের ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং মাতিস যেন তাঁর দৃষ্টি খুলে দিলেন। এখানে যা তাঁকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করল তা হল ছবিতে রঙের মুক্তি ও ফর্মের নকশাধর্মী ছন্দোময় প্রকাশ। মাতিসের প্রতি গভীর অনুরাগের কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

'One sees pictures of Matisse which are full of great inward vitality, produced by the stress of the inner need, and also pictures which passes only outer charm, because they painted on an outer impulse'.

এই দীর্ঘ ভ্রমণের দিনগুলি ছিল তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গ্রহণ-বর্জনের সময়। ১৯০৮ সালে ম্যুনিখে ফিরে আসার পর তাঁর ছবিতে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সঞ্চয় এক্সপ্রেশনিস্ট ধাঁচে আঁকা বিভিন্ন ল্যানডস্কেপ-গুলিতে ফভেদের মতো রঙের উগ্রতা ও আঘাত লক্ষ করার মতো। আদিম শিল্পীদের প্রত্যক্ষ আবেগময় অভিজ্ঞতাকে এই সময় থেকে তিনি যেন সরাসরি কাজে লাগাতে থাকেন। বিষয়ের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল আকারের উদ্দীপক অভিব্যক্তিতে। যদিও এই সময়ের ছবিতে ডিটেলস প্রায় অনুপস্থিত ও প্রাকৃতিক বস্তুগুলি (যেমন পাহাড়, গাছপালা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি) ক্রমশ অস্পষ্ট আভাসের আড়ালে সরে যাচ্ছিল, তবু এগুলি ছিল আশ্চর্য সজীব আর প্রাণবন্ত।

নিউ আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব ভাবনাচিন্তার এমন রূপদানের জন্যে ১৯০৯ সালে তিনি নতুন একটি শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তুললেন যা 'Neue Kunstler Vereinigung' বা 'নিউ আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' নামে খ্যাত। এই গোষ্ঠীতে যেসব শিল্পী যোগ দিলেন তাঁরা হলেন অ্যালেক্সি ভন যাওলেনস্কি, অ্যালফ্রেড কুবিন, গ্যাব্রিয়েল মুন্টার এবং পরে ফ্রাঞ্জ মার্ক। এঁরা একদিক যুগেনস্টীল আর অন্যদিকে ফভ শিল্প-ধারাকে মিলিয়ে এক নতুন স্টাইল তৈরি করতে চাইলেন। প্রথম দিকে এঁদের সঙ্গে মতামতের মিল থাকলেও কানডেনস্কির নিজস্ব ধ্যানধারণা যতই প্রকট হতে থাকল ততই এঁদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে লাগল। NKV গোষ্ঠীর শিল্পীরা কানডেনস্কির ছবিতে বস্তু বর্জনের (non-objective) ঝোঁক ও বিমূর্তকরণকে (abstraction) ভালো চোখে দেখছিলেন না। ১৯১১ সালে ডিসেম্বরের ওই প্রদর্শনীতে ওই গোষ্ঠীর সদস্যেরা তাঁর একটি ছবিকে বাদ দিলে কানডেনস্কির সঙ্গে মতবিরোধ চরমে উঠে, তিনি ওই গোষ্ঠী থেকে বার হয়ে যান।

বাইরে এসে তাঁর একমাত্র সমর্থক ফ্রাঙ্ক মার্ককে সঙ্গে নিয়ে 'ডার ব্লাউএ রাইটার' (Der Blaue Reiter) বা 'দি ব্লু রাইডার' নামে একটি নতুন দল তৈরি করলেন।

দি ব্লু রাইডার

'ডার ব্লাউএ রাইটার' গোষ্ঠীর শিল্পচর্চার পিছনে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল আদিম ও প্রাচীন শিল্পরীতি এবং শিশুদের অঙ্কনের প্রতি এক অন্তরঙ্গ আবেগময় যোগাযোগ আর ভালোবাসা। এ বিষয় আমরা জানতে পারি—১৯১২ সালে কানডেনস্কি ও মার্ক সম্পাদিত ডার ব্লাউএ রাইটার পঞ্জিকা থেকে। এতে আদিম ও লোকশিল্প, শিশুদের আঁকা স্কেচ ও জলরঙের ছবি, এশিয়া ও আফ্রিকার নানা শিল্পনিদর্শন, ব্রাজিলের মুখোস, মেক্সিকোর পাথরের মূর্তি, মধ্যযুগীয় কাঠখোদাই শিল্প, মিশরীয় পুতুল ও অন্যান্য শিল্পবস্তুর প্রতিলিপি প্রকাশের সঙ্গে খ্যাতনামা সঙ্গীতবেত্তাদের (যেমন Schonberg, Webern ও Berg)-এর রচনা এবং নাটক ছাপা হয়।

আর এই একই সময় কানডেনস্কি শিল্পবিষয়ক তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার কথা তুলে ধরলেন তাঁর লেখা একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে "উয়েবার ডাস গাইসটিগে ইন ডার কুনস্ট" ("Uber Das Geistige in Der Kunst") নামে এই গ্রন্থটি আধুনিক শিল্প-ইতিহাসে এক দিক্‌চিহ্নকারী নির্দেশিকা হিসেবে আমাদের হাতে এসে পৌঁছল। ১৯১০ সালে লেখা এই গ্রন্থটি জার্মানিতে প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে; আর এর ইংরাজি অনুবাদটি এসে পৌঁছয় ১৯১৪ সালে 'The Art of Spiritual Harmony' এই নামে। এই গ্রন্থের মধ্যে কানডেনস্কি শুধুমাত্র শিল্প বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্যই প্রকাশ করেন নি, শিল্পের ভাষা বুঝতে ও তাকে অনুসরণ করতে আমাদের সাহায্য করেছেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন যে, প্রত্যেক শিল্পকে তার সময় বা যুগচরিত্রকে (spirit of age) প্রতিফলিত করতে হবে। আবার শুধু যুগচরিত্রকে প্রতিফলিত করলেই চলবে না, ভবিষ্যতের জন্যে তাকে রেখে যেতে হবে এমন কিছু বাণী যা আগামী দিনের শিল্পের অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে কাজ করবে। তাই তিনি বলেছেন, 'The art, which has no power for the future, which is only a child of the age and cannot become a mother of the future, is a barren art.' আধুনিক জীবনযাত্রায় অতিরিক্ত পরিমাণে বস্তুমুখীতায় আমাদের মনোজগতে এক নৈরাজ্য তথা আধ্যাত্মিক সংকটের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ওই 'আধ্যাত্মিকতা' যা শিল্পের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রধান শর্ত ও শাশ্বত সত্য, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিল্প সৃষ্ট হবে ভিতরের প্রয়োজনে (inner need)। তিনি বলেছেন প্রতিটি বস্তুতে প্রাণারোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি যেন প্রাচ্যদেশীয় মিস্টিসিজমের পক্ষপাতী হয়েছেন। আবার কখনও বা এর ভিতর আদিম অভিজ্ঞতার যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে আমাদের মতো আদিম শিল্পীরাও যেন শিল্পে শাশ্বত সত্যের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

আদিমতাপ্রীতি

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০৭ সালে তিনি বার্লিন নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় আফ্রিকার শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরবর্তী কালে ১৯১১ সালে ওই একই সংগ্রহশালায় আফ্রিকা এবং পেরুর ভাস্কর্যগুলি নিয়ে রীতিমতো অনুশীলন শুরু করেন।

ইতিপূর্বে পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে গোগ্যাঁ এমন আধ্যাত্মিক সংকটের কথা বলেছেন যা এক আদিমতার প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তি প্রায়

প্রায় কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছে। এ ছাড়া, ফভ শিল্পীদের আদিমতাপ্রীতি ও ব্রুয়েকে গোষ্ঠীর আদিমতার বহিরঙ্গ প্রকাশ কানডেনস্কিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। তবে তিনি আদিমতার আবেগময় অভিব্যক্তিকে ধরতে চেয়েছিলেন একেবারে ভিতরের দিক থেকে অন্তর্জাত অভিজ্ঞতার আলোয়। তিনি বারবার ভিতরের কথা বলেছেন, আর ভিতরের তাগিদেই শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তার দিকে ঝুঁকেছেন। ধীরে-ধীরে বস্তুর বিমূর্তকরণ ঘটিয়েছেন, ফিরে গেছেন বস্তুর মৌল গঠনে, কতকগুলি জ্যামিতিক আকারে। সেজান যে পথ ধরে এগিয়েছিলেন, তিনি যেন গেলেন আরো এক ধাপ এগিয়ে।

বিমূর্ত বা জ্যামিতির ফর্ম

কিউবিজমে বিষয় বা বস্তু (object) বর্জনের যে ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছিল এবং একটি বিষয়কে নামমাত্র সামনে রেখে অজস্র সরল রেখা ও কোণে অথবা বক্ররেখায় তাকে ভেঙে যে ছন্দোময় ঐকতান সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষ করা গেছে, তারই সার্থক পরিণতি আমরা লক্ষ করি কানডেনস্কির ছবিতে। কানডেনস্কি একথা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে একমাত্র বিমূর্ত বা জ্যামিতিক ফর্মের অন্তর্জীবন প্রকাশের এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে এবং ভিতরের আবেগ অভিব্যক্ত হয় এমনই কতকগুলি জ্যামিতিক আকারে। তিনি বলেছেন,

'Form alone, even though totally abstract and geometrical, has a power of inner suggestion. A triangle (without the accuracy considerations of its being acute or obtuse-angle or equilateral) has a spiritual value of its own. In connection with other forms, their value may be somewhat modified, but remains in quality the same. The case is similiar with a circle, a square, or any conceivable geometrical figure.'

কানডেনস্কি যেন এইসব ফর্মের ভিতর খুঁজে পেতে চাইলেন আরো গভীর তাৎপর্যকে। এর ভিতর তিনি আধ্যাত্মিক অর্থের অনুসন্ধান করলেন। তিনি বলেছেন, ফর্ম যত বেশি বিমূর্ত হবে তত বেশি তা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে সমর্থ। ফর্মের সঙ্গে শিল্পীর একাত্মতাকে তিনি 'আধ্যাত্মিক স্বর্গলাভ' (Spiritual Kingdom) বলেছেন।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রঙের ব্যাখ্যা

শুধু ফর্ম নয়, সঙ্গে-সঙ্গে রঙের কথাতেও তিনি এসে পড়েছেন। রঙের নিজস্ব অস্তিত্বের কথা তিনি জেনেছিলেন 'ফভ' শিল্পীদের কাছে। তাঁর মতে, শুধু চোখে কেমন দেখায় রঙের সেটাই বড়ো কথা নয়, হৃদয়ে তা কতটা ধরা দেয় সেইদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। তাঁর মতে, রঙ যখন মনের মধ্যে প্রবেশ করে নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে, তখনই নতুন মাত্রা পেতে থাকে। ফর্মের মতো সেও 'আত্মার প্রতিধ্বনি' (vibration of the soul) বয়ে আনে। তাই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রঙের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের মনের উপর রঙের নানান প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন তাঁর গ্রন্থে। রঙের চরিত্রগত বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন কোনো রঙ কঠিন, কোনো রঙ কোমল; কখনও তা উষ্ণ, কখনও শীতল; কখনও বা তাকে কর্কশ আর তীব্র বোধ হয়। ওই রঙের ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা আন্দোলিত হই। রঙ ধ্বনির মতো আমাদের বোধকেন্দ্রে সরাসরি আঘাত হানে। তিনি বলেছেন,

'Generally speaking, colour is a power which directly influences the soul. Colour is the keyboard, the eyes are the hammers, the soul is the piano with many strings. The artist is the hand which plays, touching one key or

another to cause vibrations in the soul.'

রঙের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি চলে গেছেন প্রতীকী অর্থের দিকে। কালো আর সাদা রঙের চরিত্রগত পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, সাদা হচ্ছে এমন জগতের প্রতীক যেখানে এক ভয়ানক নৈঃশব্দ্য শবাধারে আচ্ছাদিত একখণ্ড বস্ত্রের মতো আমাদের ঢেকে রাখে আর এক দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মতো আমাদের আড়াল করে; অথবা সংগীতের ক্ষণবিরতির মতো স্বরমাধুর্যকে বাড়িয়ে তোলে, যেন-বা প্রাকজন্মমুহূর্তে এক গভীর নীরবতা অনন্ত সম্ভাবনায় উন্মুখ হয়ে থাকে। অন্যদিকে, কালো যেন একেবারে অনড়, অচল, মৃতবৎ, হিম নৈঃশব্দ্য; চিতার ভিতর জ্বলে ওঠা শেষ ছাই; গতিহীন শব-দেহের মতো; যেন-বা তা সংগীতের অন্তিম বিরতি। ফর্ম ও রঙের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বারবার সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এনেছেন। আসলে তিনি চিত্রকলা আর সঙ্গীতের ভিতর এক গভীর আত্মিক যোগা-যোগের কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

চিত্রকলা ও সঙ্গীতের আত্মিক যোগাযোগ

সংগীতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা শৈশব থেকেই। ভাগনার, দেবুসি, মুসোরস্কি, শ্যোনবার্গ প্রমুখ একাধিক কম্পোজারদের মহত্ত্বের কথা তিনি তাঁর গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের সুরসৃষ্টির ভিতর তিনি আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ দেখতে পান। কানডেনস্কি বারবার ভেবেছেন সমস্ত বস্তু বা বিষয়ের শর্তাধীন ছাড়িয়ে সংগীতের আশ্চর্য ধ্বনি চৈতন্যের যে স্তর ছুঁয়ে যায়, চিত্রকলার রেখা ও রঙ কি তা পারবে না? সংগীতে ধ্বনির ঘাত-প্রতিঘাত, নাটকীয় উত্থানপতন, ক্ষণবিরতি বা স্তব্ধতার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক মুহূর্ত সৃষ্টি করা হয়, যা ভাষায় ব্যক্ত করা প্রায় অসম্ভব, চিত্রকলায় তা সম্ভব হবে না কেন? ওইসব প্রশ্নের উত্তরে তিনি রেখা আর রঙকে সকল রকম প্রাকৃতিক শর্তাধীনতা থেকে মুক্ত করে তাকে শুদ্ধ রূপে ধ্বনির মতো ব্যবহার করতে চাইলেন। বিচিত্র বর্ণের আকারগুলি সিম্ফনির মতো বেজে উঠল তাঁর ছবিতে। ছবির সমস্ত ক্যানভাস যেন হয়ে উঠল এক সাংগীতিক ক্ষেত্র (musical space), রেখা হল সাংগীতিক গতি (musical movement) এবং রঙ হল সাংগীতিক কম্পন (musical vibration)। সংগীতে যেমন স্তরে-স্তরে সুরের জাল বিস্তার করা হয়, তেমনি ছবিতে তিনি রঙিন আকারগুলি ভাঙতে-ভাঙতে এক নৈঃশব্দ্যের অনন্ত ক্ষেত্রের দিকে উন্মোচিত করলেন। হৃদয়ের গভীর অন্ধকার উন্মোচিত হল আলোয়। আর এরই ফলে শিল্পে এল গতি। সবই যেন অশান্ত ও অস্থির এবং সজীব ও প্রাণবন্ত। তাই শিল্পকর্মটি আর কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না; সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে অসীম রহস্য, তারই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। তাঁর কথায় ছবি হল,

'The symphony of form that arises from the chaotic hubbub of cosmic elements which we call the music of spheres.....'

শিশুরা যে জগতের বাসিন্দা

এই আত্মোদ্‌ঘাটনের পথ ধরেই তিনি যেন ফিরে গেলেন একেবারে সৃষ্টির উৎসে—এক সহজ সরল বিস্ময়ের জগতে। শিশুরাই কেবল এই জগতের বাসিন্দা, তাদের দৃষ্টি দিয়ে তিনি ধরতে চাইলেন বিশ্বের সকল সত্যকে। এই সত্য বারবার প্রতিবিম্বিত হল তাঁর অবচেতনে। অজান্তে তিনি অনুসরণ করলেন শিশুদের রচনার আশ্চর্য শৈলীকে। তিনি বলেছেন,

'.....There is an enormous, unconscious strength in children on as high (and often on a higher) a level as that of adults...the artist who throughout his life is similar to children in many things, can attain the inner harmony of things more easily can others.....'

আর শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শিশুদের আঁকা বস্তু বা বিষয়ের সরল, সাদাসিধে খোলসের ভিতর দিয়েই অন্তর্নিহিত মূল্যের (inner value) প্রকাশ ঘটে। যদিও ১৯১০ সাল নাগাদ কানডেনস্কি চিত্রকলায় বিমূর্তকরণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তাঁর গ্রন্থে, তবু তার সার্থক রূপ দিতে তাঁর আরো বছর তিনেক সময় লেগেছিল। নির্বস্তুক জ্যামিতিক আকারে তেলরঙে আঁকা তাঁর ছবি আমরা প্রথম পাই ১৯১৩ সাল থেকে। তবে বিমূর্তকরণের এমন সিদ্ধান্ত তিনি হঠাৎ একদিনে নেন নি। এর পিছনে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা কাজ করেছিল।

বিমূর্তকরণের ক্রমবিকাশ

তাঁর চিত্রকলায় পার্থিব সকল বস্তু বর্জন এবং বিমূর্ত আকারের মধ্যে আত্মপ্রকাশের তাগিদ শুরু হয়েছিল আনুমানিক ১৯০৮ সাল থেকে। এই সময় তাঁর ছবিগুলি ছিল লিরিক্যাল আর অলঙ্কারধর্মী। ধীরে-ধীরে ফভদের অনুসরণে আঁকা একাধিক ল্যানডস্কেপে পথ-ঘাটের দৃশ্যাবলীর মধ্যে এক উগ্র জোরালো অভিব্যক্তি আর উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯০৮-৯ সালে আঁকা এইসব ছবিতে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ক্রমশ সরে যাচ্ছিল এবং ছবি-গুলির সরলতার ভিতর বিমূর্তকরণের ঝোঁক লক্ষ করার মতো। ১৯১০ সালের পর প্রাকৃতিক বস্তু-গুলিকে (যেমন গাছ, পাথর, কিংবা বাড়িগুলি) আমরা যেন স্পষ্ট চিনতে পারি না; তাদের স্বাভাবিক আকৃতি হারিয়ে এক জ্যামিতিক নকশার আড়ালে মুখ লুকাল, আর শেষ পর্যন্ত সেগুলি বিমূর্ত অবয়ব ধারণ করে কতকগুলি বর্ণময় জ্যামিতিক আকারে সংস্থাপিত হল।

কানডেনস্কির বিমূর্ত ছবি আঁকার সূত্রটি খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে তাঁর রেখাধর্মী অজস্র ড্রইংগুলিতে। ম্যুনিখের Stadtische Galarie-তে রক্ষিত Munter collection-এর একাধিক ড্রইং পর্যালোচনা করে সমালোচক ইটনার (Lorenz Eitner) এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কানডেনস্কির ছবিতে নির্বস্তুক উপস্থাপনার ভাবনা রঙিন ছবিতে প্রতিফলিত হবার অনেক আগেই রেখাধর্মী ড্রইংগুলিতে ধরা পড়েছিল। তিনি আরো জানিয়েছেন যে সম্ভবত আদিম শিল্পীদের আর শিশুদের আঁকা স্বতঃস্ফূর্ত ড্রইংগুলির প্রতি আগ্রহ থেকেই তাঁর এমন ভাবনায় আসা। নির্মিতির দিক থেকে ছবিতে বিমূর্ত চেহারা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অনেক সময় তিনি নকশাগুলিকে তরল কালি বা জলরঙ দিয়ে ধুয়ে দিয়েছেন; এতে বিস্ময়কর রূপ ফুটে উঠেছে। এর ফলে ছবির লাইন আর লাইন মনে হয় নি, বিভিন্ন বর্ণের সীমাসূচক কনট্যুর (contour)-এ পরিণত হয়েছে। ছবির গোটা কম্পোজিশনকে মনে হয়েছে স্পর্শময় কতকগুলি খণ্ড-খণ্ড বস্তুর একীকরণ।

ইমপ্রোভাইজেশন

কানডেনস্কি তাঁর বিমূর্ত ছবিগুলিকে তিনটি প্রধান চরিত্রের ভিত্তিতে নামকরণ করেছেন যেমন 'ইমপ্রেশন' (Impression) 'ইমপ্রোভাইজেশন' (Improvisation) এবং 'কম্পোজিশনস' (Compositions)। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অনুধাবনের ফল হিসেবে আঁকা দৃশ্যের সচিত্র উপস্থাপনাকে তিনি বলেছেন 'ইমপ্রেশন'। তাঁর মতে, 'ইমপ্রোভাইজেশন' হল অবচেতনে নিহিত নির্বস্তুক প্রকৃতির অন্তর্জাত চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আর 'কম্পোজিশন' হল ধীরে-

ধীরে গড়ে উঠা অন্তর্জাত অনুভবগুলির প্রকাশ এবং বারবার তার স্বাদ আস্বাদন ও একই ভাবনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে একটি বিশেষ রূপকে ফুটিয়ে তোলা। যদিও এখানে যুক্তি, সচেতনতা বা উদ্দেশ্যের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তবু শেষ পর্যন্ত থাকে কেবল অনুভব।

এই ভাবনাকে রূপদানের জন্যে ১৯১০-১৪ সাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয় ভাবে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন থাকেন। এই সময় কম্পোজিশনধর্মী ছবিগুলিতে বিমূর্ত আকারের নানান ফর্মগুলি নানা আকৃতি নিয়ে যেমন বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, লম্ব, রেখা অথবা বিন্দুরা ভিড় করেছে, তেমন তাদের এমন নাটকীয় উপস্থিতির ভিতর এক পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ফর্মের যেন এক-একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কখনও বা মনে হয়, এক বিস্ফোরণের মুখে পড়ে সমস্ত ফর্মগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ছোটো-বড়ো, লম্বা, বেঁটে, চ্যাপটা, সরু বা সপিল আকৃতিগুলির ভাঙচুর চেহারা সর্বনাশা, বিধ্বংসী সভ্যতার কথা স্মরণ করায়। আপাতদৃষ্টিতে ফর্মগুলিকে অসংলগ্ন, অবিন্যস্ত মনে হলেও একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এদের ভিতর পারস্পরিক এক সুশৃঙ্খল সম্পর্ক রয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে শিল্পী অবচেতনের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করেন নি। প্রতিটি ফর্মকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, নিপুণ কৌশলে বার করে এনেছেন ছবিতে। তিনি 'দাডা' বা 'সুররিয়ালিস্টদে'র মতো আকস্মিকতায় বিশ্বাস রাখেন নি। গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে ভেবে-চিন্তে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অতি সামান্য জিনিসকেও অসামান্য করে তুলেছেন তাঁর কম্পো-জিশনে।

রঙিন ফর্মগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত করার আরো তীব্র প্রবণতা আমরা লক্ষ করি ১৯২২ সালে জার্মানির ভাইমারে (Weimar) 'বাউহাউস' (Bauhaus) গোষ্ঠীতে যোগদানের পরে।

এই সময় তাঁর ছবির ফর্মগুলি আরো সরল হয়ে আসে আর সেগুলি অনেক বেশি সুশৃঙ্খল মনে হয়। 'বাউ-হাউস' গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে কত সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে কতবেশি ব্যক্ত করা যায়।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পারিতে একাকী জীবনযাপনের মধ্যে আমরা তাঁর আরো পরিণত শিল্পভাবনাকে খুঁজে পাই। এই ফর্মগুলি এক নতুন জীবনের সন্ধান পেল। নানান আকারের ফর্মগুলি দিয়ে তিনি তৈরি করলেন এক কাল্পনিক জগৎ যেখানে অদ্ভুত সব জীবজন্তু বা উদ্ভিদ ঘিরে থাকে ও অচেনা, অজানা বিচিত্র বর্ণের সব প্রজাপতি আর ঘাসফড়িঙেরা একই সাথে খেলে বেড়ায়। কার্নিভালের লণ্ঠন ও মুখোশের সাথে খোলা আকাশের শূন্যে ভাসমান ফর্মগুলি এক নৃত্যগীতে মগ্ন হল। প্রসঙ্গত ১৯৪০ সালে আঁকা 'স্কাই ব্লু' অথবা 'কম্পোজিশানটেন' এর কথা উল্লেখ করা যায়। আরো পরে 'ব্রাউন ইম্পেটাস' (১৯৪৩) অথবা 'টেমপারড এলান' (১৯৪৪) ছবিতে এক অদ্ভুত যৌনতার ভিতর কীটপতঙ্গ, ড্রাগন অথবা মাকড়সারা নিমজ্জিত হয়। এক অসীম বিশ্বের রহস্যকে খুঁজতে গিয়ে তিনি ঘুরে ফিরেছেন এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে, এক অন্ধকারের জগৎ থেকে আলোর জগতে: সেই রহস্যময় জগতের জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ কিংবা গাছ-পালারা যেন তাঁর বন্ধু, তাদের সাথে তৈরি করতে চেয়েছেন একান্ত আপন নিভৃত সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরেই যেন বা আজ আধুনিকতার যাত্রা। তাই মৃত্যুর পরেও তিনি হয়ে রইলেন আধুনিকতার প্রকৃত পুরোধা। ১৩ই ডিসেমবর ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে শিল্প-ইতিহাসে শুরু হল আরেকটি নতুন অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাদের দেখালেন বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের নতুন দরজা।

১

রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত আর কবির জীবনচরিত এক বস্তু নয়

"চতুরঙ্গ"-র কয়েক সংখ্যায় শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবের লেখা শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনের "রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" আর *In Your Blossoming Flower-Garden* বই দুটির আলোচনা; এই আলোচনা পড়ে লেখিকার উত্তর এবং সেই উত্তরে শ্রীমতী গৌরীর প্রত্যুত্তর—সব কয়টি আগ্রহভরে পড়লাম। প্রত্যুত্তরের শেষে শ্রীমতী গৌরী 'এই বিষয়টা নিয়ে ড. কেতকী কুশারী ডাইসনের সঙ্গে নিষ্ফলা তর্ক' না করার সংকল্প জানিয়েছেন। ড. কেতকী কুশারী ডাইসনের লেখা হাতের কাছে পেলে এই পত্রলেখকের তা পড়ার অভ্যাস দীর্ঘ-কালের। যিনি সাম্প্রতিক বাঙালি সারস্বত জীবনের এক জ্যোতিষ্ক, তাঁর লেখা সম্পর্কে এই আগ্রহ স্বাভাবিক। আর সেই লেখা যদি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে হয়, তাহলে তো কথাই নেই। তাঁর সঙ্গে নিষ্ফলা তর্কে আমার সাধ আর লেখাপড়ার দিক থেকে সাধ্য—কোনোটাই নেই। তা সত্ত্বেও একটি সাহিত্যিক কারণে এই বিতর্কে এসে উপস্থিত হচ্ছি।

শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবের একটি মূল প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী কেতকী তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি। প্রশ্নটা ছিল "পুনর্বা" বা "রক্তকরবী" পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁর বই দুটি পড়ায় কোনো দিক থেকে সমৃদ্ধতর হয় কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন শ্রীমতী কেতকী বোধ করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে এ এক মৌল প্রশ্ন। তাই এ প্রশ্ন "চতুরঙ্গ"র পৃষ্ঠায় তুলে ধরতে চাই। বিস্তৃত লিখতে হলে আপনার পত্রিকার অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় হবে। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখছি।

দীনবন্ধু এনড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ক্রিটিক ও ডিটেকটিভরা স্বভাবতই সন্দেহপ্রবণ। ডিটেকটিভ শব্দটি ভালো শোনায় না বলে আমরা এখানে অনুসন্ধানী শব্দ ব্যবহার করব। শ্রীমতী কেতকী যদি এল্‌মহার্স্ট, ভিকতোরিয়া আর রবীন্দ্রনাথের ত্রিভুজ-সম্পর্কের শুধুই একটি অনুসন্ধানী বিবরণ দিতেন, তাহলে এই চিঠি লেখার প্রয়োজন হত না। তিনি শুধু তা করেন নি, একই সঙ্গে তিনি অনুসন্ধানী আর সাহিত্যসমালোচকের কাজ করেছেন, "পুরবী-মহুয়া-বীথিকা"-র অনেক কবিতায়ই তাঁর অনুসন্ধানী মনের আলোকপাত করেছেন আর তাতে উজ্জ্বল কবিতাগুলি তিনি আমাদের আরেকবার পড়তে বলেছেন। তাঁর কথায় আমাদের সেই প্রিয় কবিতা-গুলি একবার কেন, অনেকবার পড়লাম। আগে কবিতাগুলির মর্মলোকে যতটুকু চুকতে পেরেছিলাম বলে মনে হয়, তার চেয়ে একটুও বেশি চুকতে পারি নি *In Your Blossoming Flower-Garden* পড়ার পর। তা সত্ত্বেও যে শ্রমে, নিষ্ঠায়, নানাভাষা-শিক্ষার উৎসাহে, পৃথিবীর তিন মহাদেশ পরিক্রমায়, তথ্যসমাহারে, টীকাযোজনায় রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়ার চিঠিগুলি শ্রীমতী কেতকী আমাদের পড়ায় ও বোঝায় সাহায্য করেছেন, তাতে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি 'সীমাবদ্ধ দৃষ্টির' যে পাঠককুলকে 'মণ্ডা-মিঠায়ে' লুব্ধ শিশুর মতো তাঁর বইয়ের একটিমাত্র পৃষ্ঠার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখেছেন, তাঁদের স্বঘোষিত প্রতিনিধি সেজে "আমরা" সর্বনামপদ ব্যবহার করি নি। নেহাত "আমি" লেখার অভ্যাস নেই বলে "আমরা" লিখছি। তবে নিজেকে লুব্ধ শিশু-দের একজন ছাড়া আর কীভাবে পরিচয় দেওয়া যায়

জানি নে। কেননা বইটা হাতে পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই পৃষ্ঠাটি চোখে পড়েছিল, যেমন তিনিও আর্কাইভসে কাজ আরম্ভ করার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভিকতোরিয়ার পাণ্ডুলিপির এ অংশটি পেয়ে যান। An Allegory of Venus and Cupid দেখা আর পাণ্ডুলিপির এ লেখাটুকু পড়ার অভিজ্ঞতা দুটিকে তিনি একজাতীয় নান্দনিক অভিজ্ঞতা বলেছেন। রতিক্রিয়ায় অনামিকার সিক্ত অধোবাসের কথা তাঁর বাঙলা বইটির উপন্যাসাংশে পড়ার পর আমাদের মনে এইজাতীয় নান্দনিক অভিজ্ঞতাই জাগুক বলে তিনি আশা করেন কি? যদি করেন, তাহলে দুঃখের সঙ্গে বলব—তাঁর উপন্যাসের এসব অংশ পড়ার অভিজ্ঞতাকে ওই দুটির একজাতীয় বা আদৌ কোনো নান্দনিক অভিজ্ঞতা বলা অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব। আমরা অনেকেই 'মণ্ডা-মিঠায়ে' লুব্ধ শিশুর মতো পাঠক বলে তাঁর বইতে আন্না তড়খড়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমেদাবাদে—তাঁর এই ভুল ধরতে পারিনি বলে তিনি নিজেই শুধরে দিয়েছেন—আমেদাবাদের স্থলে তা হবে বোম্বাই। এ ভুল লুব্ধশিশু হলেও এই পত্রলেখকের চোখে পড়েছিল এবং শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব বা তাঁর মতো অন্য সমালোচকরাও তা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন। আত্মপ্রচারের অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারি জেনেও নিজের বই থেকে এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: 'এভাবে সাতাশ বছর বয়সের গাজিপুর আর আন্না তড়খড়ের স্মৃতি-সুরভিত সতেরো বছর বয়সের বোম্বাই একাত্তর বছর বয়সের "পুনশ্চ"-র কবির মনে মিলেমিশে এক হয়ে যায়'—"তোমার সৃষ্টির পথ"। পৃ. ২২৮, ১৯৮৭। মন্তব্যটি করা হয়েছিল "পুনশ্চ"-র 'স্মৃতি' কবিতা প্রসঙ্গে।

'মণ্ডা-মিঠায়ে' লুব্ধ শিশু বলেই ভিকতোরিয়ার নিজের লেখা বাক্যটির সঙ্গে "বীথিকা"-র 'উদাসীন' কবিতার

একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ

ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ

এই দুটি পঙ্‌ক্তির আকস্মিক সাদৃশ্যটি বুঝতে পারি নি। মনে পড়ছে, শ্রীমতী কেতকী এরকম সাদৃশ্যের কথা ইংরেজি বইটিতে বলেছেন। তাঁর উদ্‌ঘাটিত ঘটনাটি ঘিরে বিজয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই পঙ্‌ক্তি দুটির সাদৃশ্য যদিই-বা থাকে, তাহলেও এই কবিতার দিক থেকে দিগন্তপ্রসারী কল্পনার সহগামী হওয়ায় এই সাদৃশ্য-আবিষ্কার আমাকে সাহায্য করে নি। "বীথিকা"র 'ব্যর্থমিলন' কবিতার নীচে লেখা ১৩৩৮? আমার পড়া রবীন্দ্ররচনাবলীতে কয় বছর আগে লিখে রেখেছিলাম—বোধ হয় ১৩৩৯ হবে। এমন লিখে রাখার কারণ, মনে হয়েছিল এই কবিতায় এবং "বীথিকা"র আরও কয়টি কবিতায় কবির কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্য বিচ্ছেদের ছাপ পড়েছে। জার্মানিতে পুত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যায় এই বিচ্ছিন্ন দম্পতির সাময়িক মিলনের আভাস আছে। শ্রীমতী কেতকী বলেছেন, 'জেনো মোরে/প্রেমের তাপস'—এসবে নাকি ভিকতোরিয়ার প্রেমের জন্য তপস্বী রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা বলেছেন। "বীথিকা"র 'বিচ্ছেদ' কবিতায়ও নাকি এই নারীর কাছ থেকে কবির বিচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছিল, এখানে মীরা আর নগেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ আভাসিত হয়েছে। পত্রলেখকের এসব ধারণা ভুল হলেও ক্ষতি নেই। ঠিক হলেও কবিতার রসাস্বাদনে একটুকুও সাহায্য করবে না। তবে ধারণা যে ভুল নয়, তার আভ্যন্তর প্রমাণ "বিচ্ছেদ" কবিতার এইসব পঙ্‌ক্তি:

দুজনে রহিলে একা

কাছে কাছে থেকে;

তুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দোঁহারে রহিল যাহা ঢেকে।

আমার ধারণা ভুল হলে যেমন ক্ষতিও হয় না এবং লাভও হয় না, তেমন কথা কি *In Your Blossoming Flower-Garden* সম্পর্কে বলা যায়? স্বামিবিচ্ছিন্না ভিকতোরিয়ার চেয়ে ব্যর্থ দাম্পত্যে বিপর্যস্তা নিজের কন্যা মীরা দেবী কি কবির মনে বেশি আলোড়ন তুলবেন না? এ কি আমরা আশা করতে পারি না?

এইসব কবিতায় আমাদের অনুমিত মীরা ও নগেন্দ্রনাথ যদি থাকেনই, তবুও কবিতাগুলির সব রহস্য অনাবৃত হয়ে যাবে—এমন দাবি সাহিত্য-রসিকের কাছে অযৌক্তিক মনে হতে বাধ্য। কিন্তু যদি ভুল করে না থাকি, তাহলে বলতে পারি *'n Your Blossoming Flowe.-Garden*-এর লেখিকা ভাবছেন, তিনি চাবি হাতে পেয়ে গেছেন আর সেই চাবিতে রবীন্দ্র মনের রুদ্ধদ্বারের তালা খুলছেন। তাঁর এজাতীয় অত্যুৎসাহে সাহিত্যিক কারণেই সায় দিতে পারি না। ভিকতোরিয়ার একটি পিকচার পোস্টকার্ড পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করলেন—এজাতীয় আলোচনায় অনুসন্ধানী মনের পরিচয় দেওয়া হয়, আর কোনো মনেরই পরিচয় ফোটে না।

আমাদের বিশ্বাস, স্রষ্টার মনে বিরাজ করে প্রতিহততমোবৃত্তিরম্য প্রদোষ (মেঘদূত, ৬১) যদিও সেখানে শ্রীমতী কেতকীর মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে জোনাক জ্বলে ওঠার মতো অল্প জীবনচরিতের আলোয় না-আলো ও না-অন্ধকার প্রদোষের মতো স্রষ্টার মনের সবটুকু দেখিয়ে দেওয়া যায়—এ-কথা কি কবি এবং ঔপন্যাসিক ড. কুশারী ডাইসন বিশ্বাস করেন? তাঁকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, "মহুয়া"র "প্রতীক্ষা", "বাণী", "প্রচ্ছন্ন" কবিতা সম্পর্কে তিনি যেভাবে algebraic শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এ ভাষায় কথা বললেও কবিতা থেকে সত্যই কি বীজগণিত নিষ্কাশন করা যায়? তাঁর মতো বিশ্বসাহিত্যের এক বিখ্যাত ছাত্রীকে অন্তবিহীন সংকোচের সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই, কবি টেনিসনের পুত্রকর্তৃক তাঁর পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনীর বৃহৎ দুটি খণ্ড পড়ে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, 'ইহা টেনিসনের জীবন-চরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে'। তিনি যেসব কবিতাকে ভিকতোরিয়ার প্রেম-ভাবনায় বিভোর রবীন্দ্রহৃদয়ের প্রকাশ রূপে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলির কোনো-কোনোটিকে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে যুক্ত করেও আগে দেখানো হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনায়। তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত ও কবির জীবনচরিত এক বস্তু নয়।

নারী আধুনিককালে গৃহসীমার বাইরে এসে তার 'রসময় প্রবর্তনা'য় আধুনিক সমাজকে সঞ্জীবিত করবে, এই ছিল কবির বিশ্বাস। ভিকতোরিয়ার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ রসময় প্রবর্তনা পেয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় এমন নারী ভিকতোরিয়ার মধ্যে তিনি দেখলেন যে তাঁর 'শক্তিবলে…মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত চন্দ্র-সূর্য-তারা পুষ্পকানন নদ-নদীকে একসূত্রে টানিয়া মধুরভাবে উজ্জ্বলভাবে আপনার চতুর্দিকে সাজাইয়া আনে, যে প্রেমের শক্তি অনির্বচনীয় আবির্ভাবের দ্বারা এতদিনকার বিচ্ছিন্ন উপেক্ষিত বিশ্বজগৎকে চক্ষের পলকে সম্পূর্ণ কৃতকৃতার্থ করিয়া তোলে'। "লোকসাহিত্য" বইটির "গ্রাম্য-সাহিত্য" প্রবন্ধের এই উদ্ধৃতিতে যা বলা হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজয়ার মধ্যে অনুভব করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির যে আলোচনা ড. কেতকী কুশারী ডাইসন করেছেন, তাতে তিনি আমাদের ভাবনা নানাভাবে জাগিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। মনে পড়ছে, শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবও লিখেছিলেন যে তাঁর এই আলোচনা ভাবনার উদ্দীপক হলেও বিতর্কের অবকাশ আছে। এরকম একটি বিতর্ক তুলে আজ এই চিঠি শেষ করছি। হাতের কাছে বই নেই বলে উদ্ধৃতি দিতে পারছি নে। কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ছে শ্রীমতী কেতকী প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণ নিক্ষেপ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ কি মাদাম কুরীর মতো নারীগণের নিরাসক্ত জ্ঞানতপস্যার কথা জানতেন না? তাহলে তিনি কী করে বলতে পেরেছেন সন্তানের জননী হতে হয় বলেই নারীর পক্ষে নিরাসক্ত

হওয়া সম্ভব নয়? এ প্রসঙ্গে "সমাজ" বইটির অন্তর্ভুক্ত 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই। যতদূর মনে পড়ছে, এই প্রবন্ধের উল্লেখ তাঁর বইতে নেই। নিরাসক্তা অতিমানবীরা এতকাল কেন মানবসমাজে দেখা দেন নি—তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার শেষে কবি লিখেছেন 'এখন থেকে অতিমানবীরা সংসারে আপন পুরো জায়গা পাবে বলে আশা করি।' এহেন রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করার আগে শ্রীমতী কেতকী এই প্রবন্ধটি পড়ে নিলে পারতেন। "স্ত্রীর পত্র" গল্পের উচ্চকণ্ঠ অথচ মৃদুক্রিয় মৃণালের চেয়েও সবলা এবং একই সঙ্গে "অপরিচিতা" কল্যাণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সার্থকতার আভাস দিয়েছেন, তার উল্লেখও যেন তাঁর বাঙলা বইটিতে দেখি নি। তবে একথা ঠিক, "প্রগতিসংহার" গল্পে রবীন্দ্রনাথ ফেমিনিজমকে ব্যঙ্গ করেছেন। কেন না, তাঁর মনে হয়েছে, এতকাল পুরুষ, পুরুষ থেকেই যেমন অতিমানব হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যৎ কালে নারীকেও নারী থেকেই অতিমানবী হতে হবে। আর শ্রীমতী কেতকীর অনামিকার উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ কী বলতে পারতেন তা তাঁর "বীথিকা"-র "অপ্রকাশ" কবিতার ভাষা থেকে অনুমান করতে পারি :

ভোগীর বাড়াতে গর্ব ব্যর্থ করিয়ো না আপনারে
খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।

অবশ্য তাঁর উপন্যাসে অশনিই শুধু ভোগী নয়। অনামিকাও এক জাতের মহিলা।

দেবদাস জোয়ারদার
৯৭-এ রিজেন্ট এস্টেট
কলকাতা-৯২

২

ডিসেম্বর '৯১ সংখ্যার দুটি প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য

চতুরঙ্গের ডিসেম্বর '৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের "ম্যাক্সমুলারের ভারতপ্রেম : একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। এই চমৎকার রচনাটি ম্যাক্সমুলার সম্পর্কে বহু শিক্ষিত মানুষের দীর্ঘকালীন ধারণায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম। প্রবন্ধপাঠের সময় অভিভূত মন হোঁচট খেয়েছে কেবল শেষের দিকে পৌঁছে। মনে হয়েছে আমাদের মন যেন কিছুতেই পুরোপুরি সোজা রাস্তায় হাঁটতে পারে না, অন্তত একবারটি মার্কস মোড় না ঘুরে। মার্কস মহান পুরুষ নিশ্চয়, কিন্তু ম্যুলারের চিত্রাঙ্কনে তিনি কোনো সাহায্য করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

"আমার রবীন্দ্রনাথ-ভিকতোরিয়া বিষয়ক বই দুটির সূত্রে" শীর্ষক আত্মকথনটি পড়ে শ্রীমতী ডাইসন সম্পর্কে হতাশ হয়েছি। তাঁর মতো শক্তিময়ী লেখিকার কেন যে সাড়ে-তেইশ-পৃষ্ঠা-ব্যাপী অনর্গল বাক্যস্রোতের প্রয়োজন হল বুঝে উঠতে পারছি না। পাতার পর পাতা এলোমেলো কথা। একই বক্তব্যের প্রচুর পুনরাবৃত্তি, ব্যক্তিগত জীবনের অনাবশ্যক পরিচয়, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ক্লান্ত করে তোলে পাঠকের মন।

মীনাক্ষী ঘোষ
৪৩ অফিসার্স ফ্ল্যাট
জুবিলি রোড
জামসেদপুর-১

৩

বাঙলা গাথাসাহিত্যের প্রথম সংগ্রাহক সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?

"চতুরঙ্গ" জুন ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত অরবিন্দ সামন্তের প্রবন্ধ "বাঙলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে

চণ্ডীমণ্ডপ" প্রসঙ্গে "চতুরঙ্গ" সেপটেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় "মানিকচাঁদের গীত" শীর্ষক যে পত্রটি (লেখক : দেবাশিস নাথ, আসানসোল-৭১৩৩০৩) প্রকাশিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আমারও অভিমত উপস্থাপন করতে চাই।

পত্রলেখক দেবাশিসবাবু যদিও প্রবন্ধলেখক অরবিন্দবাবুর কাছে তাঁর দেখা "মানিকচাঁদের গীত" শীর্ষক পুস্তকটির পূর্ণ পরিচয় জানার জন্য আর্জি প্রকাশ করেছেন, তবুও অরবিন্দবাবুর নীরবতায় আমরাও দেবাশিসবাবুর সন্দেহের সঙ্গেই একমত হতে চলেছি যে অরবিন্দবাবুর দেখা "মানিকচাঁদের গীত" বইটি একটি ১০০% খাঁটি ব্রাহ্মণ্যবাদী জালিয়াতি-কর্ম, যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিকল্পবাদী পদ্ধতির সাহায্যে প্রকৃত বাস্তব-অস্তিত্বসম্পন্ন গ্রীয়ারসন-সংগৃহীত "*The Song of Manikchandra*" (1878)-কে ঢেকে দেওয়া।

কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, শুধু অরবিন্দবাবুই নন, এপার বাঙলার প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক তথা রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার-ও সম্ভবত সমপর্যায়ের কোনো জাল পুস্তকের ফাঁদে পড়েছেন। কেননা, পবিত্রবাবু গ্রীয়ারসন সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাঁর (অর্থাৎ গ্রীয়ারসনের) আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে রংপুরের "মানিকচন্দ্রের গান"…' (বিশ্বকোষ, সাক্ষরতা, দশম খণ্ড ১৯৮৭, ২য় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ১২৫)। বলাই বাহুল্য, গ্রীয়ারসন জীবনে কখনো মানিকচাঁদ-সংশ্লিষ্ট কোনো পুঁথি-পুস্তক রংপুর থেকে 'আবিষ্কার' করেন নি, 'প্রকাশ'-এর প্রশ্ন তো ওঠেই না। গ্রীয়ারসন যা করেছেন, তা হচ্ছে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" শীর্ষক একটি লোক-ভাষা বা মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ এবং পত্রিকায় প্রকাশ। পবিত্রবাবুর ওই মন্তব্যে পাঠক-সাধারণের মনে বিভ্রান্তি জাগা স্বাভাবিক যে, গ্রীয়ারসন বুঝি রংপুর থেকে মানিকচাঁদ-সংশ্লিষ্ট কোনো লিখিত সাহিত্য আবিষ্কার করেছেন, মৌখিক সাহিত্য নয়॥ বহুদর্শী মানুষেরা বহু কিছু দেখে থাকতে পারেন, যেমন অরবিন্দবাবু দেখেছেন "মানিকচাঁদের গীত"-নামক এবং পবিত্রবাবু দেখেছেন "মানিকচাঁদের গান" নামক বই। কিন্তু আমরা যেন মূল সত্যটি বিস্মৃত না হই; তা হচ্ছে গ্রীয়ারসনের "The Song of Manikchandra" যা Journal of Asiatic Society-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল.-প্রাপ্ত গবেষণা-গ্রন্থে ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্যও লিখেছেন, 'নাথগীতিকার অন্তর্গত কাহিনীগুলি·· সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হইয়া সর্বভারতীয় গাথাকাব্যের রূপ লইয়াছে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহাদের প্রচারই ইহাদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। ···রংপুর হইতে সর্বপ্রথম গ্রীয়ারসন সাহেব কর্তৃক নাথগীতিকার অন্তর্গত একটি গাথা সংগৃহীত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (প্রথম ভাগ, ৩নং, ১৮১ সংখ্যা) গ্রীয়ারসন সাহেব "মানিকচন্দ্রের গীতি" শীর্ষক··· পল্লীগাথাটি প্রকাশিত করেন। এই গাথাটি বাংলা গাথাসাহিত্যের সর্বপ্রথম সংগ্রহ। ইহার পূর্বে আর কোনো বাংলা গাথা মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং শুধু "মানিকচন্দ্রের গীতি" নহে, সমগ্র বাংলা গাথা-সাহিত্যের প্রথম সংগ্রাহক আর প্রকাশক গ্রীয়ারসন সাহেব। ইহার পর হইতেই সুধী সমাজে বাংলা গাথা সংগ্রহের সাড়া পড়িয়া যায়,···। গ্রাম্য কবি-গণের মুখে-মুখে প্রচারিত অনেক গাথা সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়··· ।" (বাংলা গাথাকাব্য, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ ৯৮৮)।

গ্রীয়ারসনের "মানিকচন্দ্র রাজার গান"-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে রাজপুত্র গোপীচাঁদ। শুধু বাঙলায় নয়, বহুবিধ ভারতীয় ভাষায় নাথযোগীরা গোপীচাঁদের কাহিনী চারণকবিদের মতো সমস্ত ভারতে একদা গাইতেন এবং আজো গাইছেন। গবেষক বহ্নিকুমারী আরো লিখেছেন, 'বাঙ্গলাদেশের

ও পূর্বভারতের অন্যপ্রান্তের নাথপন্থী যোগীরা পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তরুণ বাঙালী রাজপুত্রের এই সকরুণ গাথা গাহিয়া বেড়াইত। এখনও বাঙ্গলায়, বিহারে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, পাঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে, মহারাষ্ট্রে, মধ্যভারতে ও উড়িষ্যায় গোরখপন্থী ভিখারীরা একতারা-গোপীযন্ত্র-সারেঙ্গ সহযোগে গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।' (সূত্র : পূর্ববৎ, পৃ ১৯০)। রাজপুত্র গোপীচাঁদের এই কাহিনী মুখে-মুখে সর্বভারতে প্রচার লাভের অন্যতম কৃতিত্ব বহন করেছেন মুসলমান চারণকবিরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থে ড. কল্যাণী মল্লিক মন্তব্য করেছেন, 'অঙ্গাপি রংপুরে এই গীত "পালাগান" রূপে গীত হয়। তাহার মূল গায়ক অধিকাংশ স্থলেই মুসলমান। ধুয়া গাহিবার জন্য তাহাদের দল থাকে।' "নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী", কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০, ইতিহাস অংশ, পৃ ২৩)। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদ্যোগের ফসল নাথসংস্কৃতিসঞ্জাত এই সর্বভারতীয় গুরুত্বসম্পন্ন মৌখিক কাহিনীকে চোখের আড়ালে রাখার জন্য নানাবিধ কূটকৌশল এক-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত "রেনেসাঁস"-এর সময় থেকেই প্রয়োগ করে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে দীনেশচন্দ্র-শহীদুল্লাহ দ্বিজাতিতত্ত্ববিরোধী এই কাহিনীর গুরুত্ব তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ উদার আর সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে জনগণের সামনে তুলে না ধরলে, আজ যে সেটি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতাম তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

হিন্দু-মুসলমানের ভেতরে দ্বন্দ্ব বাধানোর জন্য আমরা "যত দোষ, নন্দ ঘোষ" নীতি অনুযায়ী ইংরেজকে দোষ দিতে দারুণভাবেই অভ্যস্ত। সত্যিই যদি তা-ই হত, তাহলে "চতুরঙ্গ" (মার্চ ১৯৯১, পৃ ৯১৯) পত্রিকায় জনৈক পাঠক এই অসাধারণ জিজ্ঞাসাটি রাখতেন না, 'প্ররোচনাদানকারী তৃতীয় পক্ষ রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হয়ে গেলেও আমরা যে এখনো আত্মস্থ হতে পারছি না তার মূলে কি তাহলে আর কোনো কারণ আছে?' বলাই বাহুল্য, এই 'আর কোনো কারণ'-টি আর কিছুই নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদ। গোপনে ক্রিয়াশীল বলেই তা ধরতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। আর, 'চোরের মার বড়ো গলা' নীতি অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রচারমাধ্যমের দেওয়া ব্যাখ্যার ফলেই আমরা বিভেদকামী শক্তি হিসেবে শুধুমাত্র ইংরেজকে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি। আসল দোষীরা এজন্যেই চিরকাল পার পেয়ে যাচ্ছে।

দ্বিজাতিতত্ত্ববিরোধী নাথসংস্কৃতি সম্পর্কে ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন, দীনেশচন্দ্র-শহীদুল্লাহ সে আলোচনায় জোয়ার তুলেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী গোপন-ব্রাহ্মণ্যবাদে অভিষিক্ত বলে এ ব্যাপারে আলোচনার বদলে সেটিকে ধামাচাপা দেবার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। উপেক্ষা, বিকল্পবাদ, সত্য গোপন করে মিথ্যা ভাষণ ছাড়াও প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ আর উদার বুদ্ধিজীবীদের ওপরে ঠারে-ঠোরে সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে, জনগণের মনে তাদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেছেন এবং আজো করছেন। ইতিহাসের নামে ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্যশীর্ষক গাঁজাখুরি গল্প লেখা বন্ধ করতে হলে, দ্বিজাতিতত্ত্বে প্রশ্রয়দানকারী গোপন ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির ফল্গুপ্রবাহটিকে সবার আগে চিহ্নিত করতে হবে।

ড পবিত্র সরকার জ্ঞানত মিথ্যা ভাষণ করছেন, এ কথা বিশ্বাস করতে বাধে। তবুও, তাঁর সাম্প্রতিক একটি মন্তব্য : 'তাঁর (সুনীতিকুমারের) গ্রন্থের ও গবেষণার প্রেরণাতেই পরে বাংলার নানা উপভাষার বিবরণ রচিত হয়েছে···।' (সাপ্তাহিক "দেশ", ২৮. ৭. ১৯৯০, পৃ. ৩৬) বাস্তব সত্যটি হচ্ছে, গ্রীয়ারসনের লোকভাষাসংগ্রহ বা উপভাষাসংগ্রহ মানিকচাঁদ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সুনীতিকুমারের জন্মই হয় নি! সুনীতিকুমারের জন্ম ১৮৯০ সালে।

পবিত্রবাবুর যে তীব্র আপত্তিকর মন্তব্যে গ্রীয়ারসন প্রায় সাম্প্রদায়িক মিশনারির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, তা হচ্ছে, "নিউ টেস্টামেনট"-এর অমিতব্যয়ী পুত্রের কাহিনীটির অংশবিশেষকে ভারতবর্ষের নানা ভাষায় ও উপভাষায় পরিবেশন করে গ্রীয়ারসন ভারতবর্ষের যে বহুবিচিত্র ভাষার মানচিত্র নির্মাণ করেছেন তা আজ পর্যন্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অসংখ্য ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়েছে।' (বিশ্বকোষ, সাক্ষরতা, দশম খণ্ড, ১৯৮৭, ২য় মুদ্রণ, পৃ. ১২৫)। বলাই বাহুল্য, গ্রীয়ারসন এদেশে লোকভাষা "সংগ্রহ" করেছিলেন, কোনো খ্রীষ্টানি ব্যাপার "পরিবেশন" করেন নি। গ্রীয়ারসন জীবনে কখনো ভারতের জনগণের কাছ থেকে '"নিউ টেস্টামেনট"-এর অমিতব্যয়ী পুত্রের কাহিনী' সংগ্রহ করেন নি, সংগ্রহ করেছেন নাথপন্থী রাজপুত্র গোপীচাঁদের কাহিনী, মানিকচন্দ্র রাজার গানে যিনি প্রধান উপজীব্য। গ্রীয়ারসনের কোনো লোকভাষা-সংগ্রহকে সুনীতিকুমার তার "আলোচনার ভিত্তি" হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বরং সে কাজ করে গেছেন স্বয়ং দীনেশচন্দ্র। 'অসংখ্য ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকের' ব্যাপারটি জানা অবশ্য আমার সামর্থ্যের বাইরে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে ইংরেজরা এদেশে শুধু শোষণ করতেই আসে নি, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ লাগাবার জন্যই তারা দিনরাত্রি অতিবাহিত করে নি, তাদের মধ্যে ছিলেন গ্রীয়ারসনের মতো অতি মহৎচিত্ত সংস্কৃতিবিদ্, ভারতীয় গণসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশের ভেতর দিয়েই যাঁরা তাঁদের সৃষ্টিশীল জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে গণভূমিকার স্বরূপ বুঝতে এঁদের, বিশেষত গ্রীয়ারসনের, কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। যদিও সমসাময়িক কালে তাঁরা বুঝতেই পারেন নি, তাঁদের অপরিসীম পরিশ্রমের ফলগুলি একদিন একে-একে লোপাট হয়ে যাবে, বিকল্প উপকরণ বাজারে চালিয়ে তাদের কৃতিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

আর দীনেশচন্দ্র-শহীদুল্লাহ? তাঁদের প্রতি এপার বাঙলার রথী-মহারথীদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? "পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি"-র উদ্যোগে প্রকাশিত "প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা" (১৯৮৬) বইটির দিকে তাকালে হতবাক হতে হয়। সেখানে দীনেশচন্দ্রের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় নি! আর শহীদুল্লাহ সম্পর্কে নমো-নমো করে দু-একবার খুচরো শ্রদ্ধার্ঘ্য! তবে এখনো অবশ্য গ্রীয়ারসনের মতো এই দুই মনীষী ঠারেঠোরে "সাম্প্রদায়িক" (?) হিসেবে বর্ণিত হন নি, তার কারণ এঁদের জ্বলন্ত আবেদন জনগণ এখনো বিস্মৃত হন নি।

সোহিনী নাথ
নূতনগঞ্জ, বর্ধমান